দারুল ইলমের সাহিত্যপত্র

সুরভি

ইলমের সৌরভ ছড়াবে...

সংক্ষিপ্ত সূচি

পবিত্র কুরবানী: শেকড় ও স্বরূপে.....৩
কুরআনের পাথেয়: রাহমানের বান্দা.....৪
হুসনে আদাব: মাহত্ম্য ও আবশ্যকতা.....৫
ইসলাহ: আসুন নীড়ে ফিরি.....৭
কিতাব পরিচিতি: দারুল ইলমে নে'মাল বায়ানের অনুবাদ–৮
ভাষা: বাঙ্গালায় অতিথি ভাষা.....১২
ফিলহাল: আকসার প্রকৃত হকদার কারা?.....১৫
ফিলহাল: তুফানুল আকসা: হামাস থেকে যা শিখল বিশ্ব-১৬
দারুল ইলম: দিনরাত.....১৮-১৯
বাইতুল্লাহ নিয়ে রোজনামচা.....২০-২৪
দারুল ইলম: শিক্ষার্থীদের অভিব্যক্তি.....২৫-২৭
মাদরাসায় গৃহস্থলি.....২৮
রোজনামচার পাতা.....২৯-৩১

অনলাইন পরিবেশনায়: alkhairbd.com

ALKHAIR BD
[উৎকৃষ্টতার নিশ্চয়তা]
01609993976

সম্পাদক
মাওলানা হুসাইন আলহুদা

সার্কুলেশন ম্যানেজিং
রাশেদুল ইসলাম, ইয়াসিন আমীন, ওমর ফারুক, তাওহিদুল ইসলাম, জিহাদুল ইসলাম, শরীফুল ইসলাম।

সম্পাদকীয়

হজ্বের মাস চলছে। আমাদের মাদরাসা থেকে একটু দূরেই ঢাকার হজ্বক্যাম্প। এখানে পুরো দেশ থেকে হজ্বের কাফেলাগুলো এসে জড়ো হয়। এরপর বিমানের শিডিউল অনুযায়ী প্রত্যেককে নির্দিষ্ট গাড়ি করে বিমানবন্দর নিয়ে যাওয়া হয়।

আমরা মাদরাসা থেকে যে কোনো প্রয়োজনে, হজ্বক্যাম্প সংলগ্ন বাজারে যাই। কিন্তু হজ্বের মাসগুলোতে হজ্বক্যাম্প বাজারে যাওয়াটা ভিন্ন রকম সাজে। তখন নিজেকে ধরে রাখা কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। কারণ এ সময়ে হাজার হাজার বাইতুল্লাহর মুসাফির হজ্বক্যাম্পে আসা-যাওয়া করেন। সবার গায়ে থাকে শুভ্র আচ্ছাদন। জান্নাতি আভা। যাহ্, তারা আল্লাহর ঘরে যাওয়ার অনুমতি পেয়ে গেছেন। কী অনাবিল তাদের তোড়জোড়। প্রায়ই মুসাফিরগণ আত্মীয় স্বজনদের নিয়ে হজ্বক্যাম্প পর্যন্ত আসেন। বিমান বন্দরে যাওয়ার জন্য বাসে উঠার আগে আত্মীয়দের বিদায় দেন। কী অনুপম বিচ্ছেদ। অনেকে হয়তো কাঁদেন। কিন্তু আমি শপথ করে বলি, তাদের এই কান্না অতিশয় আনন্দের।

যখনই বাজারে যাই, আড়ালে দাঁড়িয়ে বাইতুল্লাহর মেহমানদের নয়ন ভরে দেখার চেষ্টা করি। কিন্তু মন ভরে না। হৃদয়ে শুধু একটাই ব্যাকুলতা: আমার কি ডাক পড়বে না!

প্রতীক্ষার প্রহর গুনছি। তাঁর ঘরে যাওয়ার বায়না ধরেছি। যখনই তিনি তাওফিক দিবেন, ছুটে যাব। তাঁর ঘরের গিলাফ ধরে তাঁকে ডাক দিব....।

সুরভির এই সংখ্যায় বাইতুল্লাহ নিয়ে বিশেষ আয়োজন রয়েছে। আমাদের নবীন শিক্ষার্থীরা নিজেদের আবেগগুলো কাগজের বুকে তুলে ধরেছেন।

এই মুহূর্তে সাম্রাজ্যবাদীরা ফিলিস্তিনে চালাচ্ছে ইতিহাসের নিকৃষ্ট তাণ্ডব। ইতিহাসে গণহত্যার যত লোমহর্ষক ঘটনা আমরা পড়েছি, তার বাস্তব দৃশ্যায়ন চলছে সেখানে। একজন মুমিন হিসেবে আমাদের প্রথম কাজ হবে সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকা ও তার দোসরদের চেনে রাখা, এবং জাতির সামনে তাদের আসল রূপ তুলে ধরা। তারা যেন আর কখনও আমাদের সামনে সত্যতার সবক শেখাতে না আসে, সে ব্যবস্থা গ্রহণ করা। সর্বোপরি নিজেদের কর্তব্য আদায়ে সহসের সাথে সজাগ হয়ে উঠা। এই সংখ্যায় ফিলিস্তিনের বর্তমান প্রেক্ষাপট ও উম্মাহর কর্তব্য বিষয়ক বেশ কিছু রচনা ছাপা হচ্ছে। আশা করছি পাঠকদের জন্য উপকারী সাব্যস্ত হবে হবে, ইনশাআল্লাহ।

'সুরভি' হলো একটি সাহিত্যপত্র। এর সাথে যুক্ত হয়ে যে কেউ ইসলামি সাহিত্য চর্চায় এগিয়ে আসতে পারে। সুরভি তার প্রতি সর্বোচ্চ আন্তরিকতা পদর্শন করবে, ইনশাআল্লাহ। সুরভিতে নবীনদের লেখাই বেশি ছাপা হয়। তাদের লেখাগুলোকে পরিচর্যা করে দ্বীন ও মিল্লাতের খেতমতে তাদের একটু আগ বাড়িয়ে দেওয়াই সুরভির একমাত্র লক্ষ্য। আল্লাহ তাআলা সুরভিকে কবুল করুন। যারা সুরভির সাথে ইসলামের বিজয় কেতন উড়ানোর স্বপ্ন দেখেন, তাদেরও কবুল করুন।

সম্পাদক
মাও. হুসাইন আলহুদা
সম্পাদক কর্তৃক *'দারুল উলম আল-ইসলামিয়া ঢাকা।'*
(কাজিবাড়ি মোড়, দক্ষিণখান, ঢাকা-১২৩০)-এর সাহিত্যপত্র হিসেবে প্রকাশিত।
০১৬০৮-৯১০১৩১
০১৬৩৮-৯২১০৯০

শেকড় ও স্বরূপে
পবিত্র কুরবানী

﴿ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ-
١٠٢ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ-١٠٣ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ-١٠٤ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ-
١٠٥ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ-١٠٦ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ-١٠٧ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ-١٠٨ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ-
١٠٩ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ١١٠ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ-١١١ -الصافات ﴾

ইব্রাহীমের ত্যাগের আভায় ভাস্বর হোক কুরবানী

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করছেন–

“অতঃপর সে পুত্র যখন ইব্রাহীমের সাথে চলাফেরা করার উপযুক্ত হলো, তখন সে (ইব্রাহীম) বলল, বাছা, আমি স্বপ্নে দেখছি কি যে, তোমাকে জবেহ করছি। এবার চিন্তা করে বলো, তোমার অভিমত কী? পুত্র বলল, আব্বাজি, আপনাকে যে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে আপনি সেটাই পূর্ণ করুন। ইনশাআল্লাহ, আপনি আমাকে সবরকারীদের একজন পাবেন। সুতরাং (সেটা ছিল এক বিস্ময়কর দৃশ্য।) যখন তারা উভয়ে আনুগত্য প্রকাশ করল এবং পিতা (নিজ) পুত্রকে কাত করে শুইয়ে দিল। আর আমি তাকে ডাক দিয়ে বললাম, হে ইব্রাহীম, তুমি স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করে দেখিয়েছ। নিশ্চয়ই এটা ছিল এক স্পষ্ট পরীক্ষা। এবং আমি এক মহান কুরবানীর বিনিময়ে সে শিশুকে মুক্ত করলাম।”-**[সূরা সফফাত: ১০২-১১১]**

সেই স্মৃতি বিজড়িত সুন্নাহ্ই আমাদের কুরবানী

হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম রাযি. বলেন, রসূলের সাহাবীগণ রসূলের কাছে আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ, এই কুরবানীর প্রেক্ষাপট কী? রসূলুল্লাহ স. আরজ করলেন: তোমাদের পিতা ইব্রাহীম আ. এর সুন্নাত। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন? আমাদের জন্য বিশেষ প্রতিদান কী? রসূলুল্লাহ স. আরজ করলেন: প্রতিটি লোমের পরিবর্তে একটি করে নেকী লাভ হবে। সাহাবাগণ আরজ করলেন: (ভেড়ার) উল হলেও? রসূলুল্লাহ স. আরজ করলেন? প্রতিটি উলের পরিবর্তেই এক নেকী!

(ইবনে মাজাহ–৩১৩৭, মুসনাদে আহমদ–১৯৩৮৩। হাদীসের মান: সনদটি দুর্বল হলেও ফাজায়েলের ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ।)

প্রতিটি উম্মাতেরই কুরবানীর আমল ছিল

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

“আমি প্রত্যেক উম্মতের জন্য কুরবানীর নিয়ম করে দিয়েছি এই উদ্দেশ্যে যে, তারা আল্লাহ তাদেরকে যে চতুষ্পদ জন্তুসমূহ দিয়েছেন, তাতে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করবে। তোমাদের মাবুদ একই মাবুদ। সুতরাং তোমরা তাঁরই আনুগত্য করবে। যাদের অন্তর আল্লাহর প্রতি বিনীত, তুমি তাদেরকে সুসংবাদ দাও।” **-[সূরা হজ্জ– ৩৪]**

কুরবানী হোক নিয়্যাতের

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন: [সূরা আনআম– ৩৪]

“আপনি বলে দিন, নিশ্চয়ই আমার নামাজ, আমার কুরবানী, আমার জীবন-মরণ সবই আল্লাহর জন্য। যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক।”

কুরবানীর পশু হবে মোটা-তাজা-উৎকৃষ্টতম:

হযরত আনাস ইবনে মালিক রাযি. বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ স. বড়ো শিঙওয়ালা, সাদাকালো রঙ মিশ্রিত দুটি বড়ো বড়ো (দু বছরের) ভেড়া কুরবানী করেছেন। দুনোটি নিজ হাতে জবাই করেছেন, তাতে বিসমিল্লাহ বলেছেন, তাকবীর দিয়েছেন এবং (যবেহের সময়ে) ভেড়ার পা-গুলো একপাশে (ডানে গুছিয়ে) রাখলেন। (বুখারি-৫৫৬৫, মুসিলম-১৯৬৬)

অতিশয় রোগা ও ক্ষীণকায় পশু দিয়ে কুরবানী হবে না!

হযরত বারা ইবনে আযিব রাযি. বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ স. কে কুরবানীর পশু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো যে, কত প্রকার প্রাণি দিয়ে কুরবানী হবে না। রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করলেন : চার প্রকার এবং হাতের আঙ্গুলে তা ইশারা করে দেখালেন। ১. এমন লেংড়া পশু, যার লেংড়া হওয়াটা স্পষ্ট। ২. এমন কানা পশু, যার কানা হওয়াটা স্পষ্ট। ৩. এমন রুগ্ন পশু, যার রুগ্নতা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। ৪. এমন ক্ষীণকায় পশু, যার মজ্জা শুকিয়ে গেছে। (মুআত্তা মালেক–১৭৫৭)

ইচ্ছাকৃত কুরবানী না করলে সে আমাদের সমাজে না থাকুক!

হযরত আবু হুরাইরা রাযি. বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেছেন, যার সম্পদ আছে অথচ কুরবানী করল না, সে যেনো আমাদের ঈদগাহের ধারে কাছেও না আসে। অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, যার সামর্থ্য আছে অথচ পশু জবাই করল না, সে যেনো আমাদের ঈদগাহের নিকটে না আসে। (ইবনে মাজাহ-৩১২৩ মুসনাদে আহমদ-৮২৭৩)

ধারালো ছুরি দিয়ে পশু জবাই করা

হযরত শাদ্দাদ ইবনে আউস রাযি. বর্ণনা করেন যে, আমি তোমাদের জন্য রসূলুল্লাহ স.এর দুটি বাণী সংরক্ষণ করে রেখেছি যে, তিনি ইরশাদ করেছেন: আল্লাহ তাআলা প্রতিটি বস্তুর উপর ইহসান করতে বলেছেন, সুতরাং যখন কাউকে (কিসাসের কারণে) হত্যা করবে, তখন তাকে উত্তম পন্থায় হত্যা করবে। আর যখন কোনো পশু জবাই করবে, তাকে উত্তমভাবে জবাই করো। তোমরা ভালো করে ছুরি ধারাবে, যাতে প্রাণীর জন্য তা আরামদায়ক হয় (সহজে জবাই কার্য শেষ হয়ে যায়)। (সহীহ মুসলিম–১৯৫৫)

গোস্ত তিন তিন তিনভাগ করা!

হযরত আহমদ ইবনে হাম্বল রাযি. বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. হতে বর্ণিত আছে যে, কুরবানীর গোস্ত তিন ভাগ করে একভাগ নিজে খাবে, একভাগ যাকে চাও হাদিয়া দিবে, একভাগ সদকা করবে। হযরত আলকমা রাযি. বর্ণনা করেন যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. আমার জন্য একটি কুরবানীর পশু পাঠিয়েছেন এবং নির্দেশনা দিয়েছেন যে, তা থেকে একভাগ যেন আমি খাই, একভাগ তার ভাই উতবার পরিবার-পরিজনদের হাদিয়া দিই, আর একভাগ সদকা করি।

(আলমুগনী-ইবনে কুদামা রহ. কৃত।)

(عباد الرحمن)– রহমানের বান্দাদের

অনুপম গুণাবলি ও পুরস্কার

রহমানের বান্দা তারা, যারা–

(১) ভূমিতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং অভদ্র-অজ্ঞলোক যখন তাদেরকে লক্ষ করে (অজ্ঞতাসুলভ) কথা বলে, তখন (এড়িয়ে) শান্তিপূর্ণ কথা বলে।

(২) যারা রাত অতিবাহিত করে নিজ প্রতিপালকের সামনে সেজদাবনত ও নামাজে দাঁড়িয়ে।

(৩) যারা প্রার্থনা করে বলে– হে প্রতিপালক, জাহান্নামের আজাব আমাদের থেকে দূরে রাখুন। নিশ্চয় তার আজাব স্থায়ী, সাঁড়াশি। নিশ্চয় জাহান্নাম অতি নিকৃষ্ট অবস্থানস্থল ও বাসস্থান।

(৪) তারা যখন ব্যয় করে, তখন না অপচয় করে, না কৃপণতা করে। বরং তাদের জীবনযাত্রা হলো, মধ্যবর্তী ও ভারসাম্যপূর্ণ।

(৫) তারা আল্লাহর সাথে (শরীক করে) অন্য কোনো উপাস্যকে ডাকে না।

(৬) তারা অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করে না। (তবে যথাযথ কারণে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী কারো দণ্ড কার্যকর করতে বা জিহাদের ময়দানে কাউকে হত্যা করতে হলে সেটা ভিন্ন কথা।)

(৭) তারা ব্যভিচার করে না।

(আর যে ব্যক্তি এসবে নিমজ্জিত হবে, সে গুনাহের মধ্যে গিয়ে পড়বে। কেয়ামতের দিন তার শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে। এবং সে তাতে চিরকাল লাঞ্ছিত অবস্থায় পড়ে থাকবে। তবে যারা (গুনাহ হয়ে যাওয়ার পর) তাওবা করবে, (এবং নতুন করে কোনো কাফের) ঈমান আনবে, এবং সৎকর্ম করবে আল্লাহ তাদের মন্দ কর্মগুলো পুণ্য দ্বারা পরিবর্তন করে দিবেন। আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।)

(৮) (রহমানের বান্দারা) অন্যায় কাজে শামিল হয় না। এবং তারা যখন খেল-তামাশা ও বেহুদা কার্যকলাপের নিকট দিয়ে যায়, আত্মসম্মান বাঁচিয়ে যায়।

(৯) এবং যখন তাদেরকে নিজ রবের আয়াতসমূহ শুনিয়ে নসীহত করা হয়, তারা সেগুলির উপর (মুনাফিকদের মতো) অন্ধ-বধীর হয়ে পতিত হয় না। (বরং গভীর মনোযোগসহ শ্রবণ করে। এবং প্রভাবিত হয়।)

(১০) যারা প্রার্থনা করে বলে, হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদেরকে স্ত্রী-সন্তানদের ব্যাপারে চক্ষুশীতলতা দান করুন। এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের আদর্শ বানান।

রহমানের বান্দাদের পুরস্কার–

(১) এরাই তারা, যাদেরকে তাদের সবরের প্রতিদান স্বরূপ জান্নাতের প্রসাদ দেওয়া হবে এবং সেখানে শুভেচ্ছা ও সালামের সাথে তাদের অভ্যর্থনা করা হবে।

(২) তারা তাতে অনন্তকাল থাকবে। তা কত উৎকৃষ্ট অবস্থানস্থল ও বাসস্থান।

পৃথিবীর সবার প্রতি আহ্বান...

(হে রসূল, মানুষদের) বলে দিন, তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে না ডাকলে তার কিছুই আসে যায় না। আর (হে কাফেরগণ,) তোমরা তো সত্যকে প্রত্যাখ্যান করেছ, অচিরেই এ প্রত্যাখ্যান তোমাদের গললগ্ন হয়ে যাবে।

-সরাসরি অনুবাদ: সূরা আল-ফুরকান–৬৩-৭৭

কুরআন কারীমের পাঠ

[সূরা আল-ফুরকান–৬৩-৭৭]

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا
وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا (٦٣)
وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا (٦٤)
وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ
إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا (٦٥) إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا
وَمُقَامًا (٦٦) وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ
يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا (٦٧) وَالَّذِينَ لَا
يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي
حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ
يَلْقَ أَثَامًا (٦٨) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا (٦٩) إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ
عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (٧٠) وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ
صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا (٧١) وَالَّذِينَ لَا
يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا
(٧٢) وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا
عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا (٧٣) وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا
هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا
لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا (٧٤) أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا
صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا (٧٥)
خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا (٧٦) قُلْ
مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ
فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا (٧٧)

হুসনে আদাব:
মাহাত্ম্য ও আবশ্যকতা

মূল: মুহাদ্দিসে কাবীর মাওলানা হাবীবুর রহমান আজমি রহ.
ভাষান্তর: মাওলানা হুসাইন আলহুদা

আদবের মাহাত্ম্য:

বড়োদের প্রতি আদব ও সম্মান প্রদর্শন করা এবং উস্তাদ ও পীর মাশায়েখদের ভক্তিভরে খেদমত করা, তাদের সান্নিধ্য গ্রহণ করা আমাদের পূর্বসূরি ওলামায়ে কেরামের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত একটি গুণ ছিল। যা এই যুগে এসে কথিত স্বাধীনচেতা মনোভাব ও (অসভ্য) পশ্চিমাপ্রীতির প্রভাবে ধাপে ধাপে বিলীন হতে চলেছে। আজ থেকে ২৫/৩০ বছর আগে আমাদের দ্বীনি মাদরাসার শিক্ষার্থীদের মাঝে যে সভ্যতা ও পরিশুদ্ধ মনোভাব, যে দৃঢ়তা ও পবিত্রতা, যে আদব ও সম্মানবোধ পাওয়া যেত, আজকাল তার শেষ চিহ্নটুকুও খুঁজে পাওয়া মুশকিল হচ্ছে। এই ঘাটতি বড়োই বেদনাদায়ক। দ্বীনি ইলমের ধারক-বাহকগণ ইসলামি সভ্যতা, ইসলামি শিষ্টাচার ও ইসলামি চরিত্রমাধুরির পুরোধা হওয়া উচিত। এ ক্ষেত্রে আমাদের জন্য আমাদের আকাবির ও সালাফদের চরিত্র ও আচার-আচরণ অনুসরণীয়। এতেই আমাদের প্রকৃত সম্মান ও চূড়ান্ত সফলতা নিহীত। এবং সালাফগণের অনুপম চরিত্রে নিজেদের গড়ে তুলতে পারলেই আমরা ইসলামের দাবি যথাযথ পূরণ করতে পারব।

আহকাম ও আদব মিলেই পূর্ণ দ্বীন

আমাদের দ্বীন যেভাবে আমাদেরকে আকাইদ, ইবাদাত ও মুআমালাত (তথা পারস্পরিক সুস্থ লেনদেন-) এর সবক দিয়েছে, তেমনি আমাদেরকে 'আদাব'-ও শিক্ষা দিয়েছে। উন্নত চরিত্র, উত্তম চাল-চলন, শ্রেষ্ঠ জীবননীতি গড়ে তোলারও শিক্ষা দিয়েছে এবং দ্বীনের অন্যান্য বিষয়াদির মতো আদব ও দৃঢ়তার শেখা ও শিখানোর তাকিদ তাগিদ দিয়েছে।

রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেছেন:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ نَبِيِّ اللهِ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –قَالَ: إِنَّالْهَدْيَ الصَّالِحَ، وَالسَّمْتَ الصَّالِحَ، وَالاقْتِصَادَ، جُزْءٌ مِنْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ. ٢٦٩٨

অর্থ: উত্তম চরিত্র, উন্নত চালচলন ও মধ্যপন্থা গ্রহণ– নবুওয়াতের পঁচিশ ভাগের এক ভাগ। (মুসনাদে আহমদ–২৬৯৮)

অর্থাৎ এই বিষয়গুলো নবীগণের পবিত্র অভ্যাস ও বৈশিষ্টাবলির মধ্য থেকে। আর এই জন্যই ওলামায়ে কেরাম বলেন:

وَيُسَنُّ أَنْ يُتَعَلَّمَ الْأَدَبُ وَالسَّمْتُ وَالْفَضْلُ وَالْحَيَاءُ وَحُسْنُ السِّيرَةِ شَرْعًا وَعُرْفًا

অর্থ: “আদব ও গম্ভীর্যতা, শ্রেষ্ঠত্ব ও লজ্জাশীলতা এবং উন্নত জীবন গঠন-নীতি শিক্ষা করা শরীয়ত ও সামাজিক প্রথা- দুইদিক থেকেই সুন্নত। (আদাবুল শারইয়্যাহ [আরবি]–খ.১, পৃ.৪৭২)

হাদীসে পাকে আরও ইরশাদ হয়েছে

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لأَنْ يُؤَدِّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ. (الترمذي– ١٩٥١)

হযরত জাবির ইবনে সামুরা রাযি. বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেছেন যে, নিজ সন্তানকে আদব শেখানো মানুষের জন্য এক সা‘ দান করা থেকে উত্তম। (তিরমিযি–১৯৫১)

রসূলুল্লাহ স. আরও ইরশাদ করেছেন,

حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدًا مِنْ نَحْلٍ أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ.

(الترمذي– ١٩٥٢)

অর্থ: কোনো পিতা সন্তানকে আদব থেকে উত্তম কোনো উপহার দিতে পারেনি। (তিরমিযি–১৯৫২)

আরও বর্ণিত হয়েছে যে, পিতার উপর সন্তানের একটি হক হলো পিতা তাকে উত্তম আদব শিখাবেন। (আওয়ারিফুল মাআরিফ)

আদব ইলম অর্জনের পূর্বশর্ত

এক হাদীসে বর্ণিত আছে যে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ، وَتَعَلَّمُوا لِلْعِلْمِ السَّكِينَةَ،وَالْوَقَارَ، وَتَوَاضَعُوا لِمَنْ تَعْلَمُونَ مِنْهُ»

(المعجم الأوسط: ٦١٨٤)

অর্থ: হযরত আবু হুরাইরা রাযি. বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেছেন–তোমরা ইলম অর্জন করো। আর ইলম অর্জনের জন্য ধীরস্থিতা ও গম্ভীরতা অর্জন করো। আর যার থেকে ইলম শিখছো, তার সামনে বিনয়াবত হও।

(তারারানি, আওসাত: ৬১৮৪)

আগে আদব শেখো তারপর ইলম

একই বিষয়বস্তুর একটি আসার (সাহাবাদের উক্তি) রয়েছে:

رُوِيَ عَنْ عُمَرَ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – قَالَ تَأَدَّبُوا، ثُمَّ تَعَلَّمُوا. (الآداب الشرعية: ٥٥٧، ج: ٣)

অর্থ: হযরত উমার রাযি. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি ইরশাদ করেন: আগে আদব শিখো, তারপর ইলম অর্জন করো।

(আল-আদাবুশ শারইয়্যাহ–খ.৩, পৃ.৫৫৭)

হযরত আবু আব্দুল্লাহ বালখি রহ. বলেন:

وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبَلْخِيُّ: أَدَبُ الْعِلْمِ أَكْثَرُ مِنَ الْعِلْمِ. (الآداب الشرعية: ٥٥٧، ج: ٣)

অর্থ: ইলম শেখার জন্য ইলম থেকেও বেশি আদব শিখতে হয়। (আল-আদাবুশ শারইয়্যাহ–খ.৩, পৃ.৫৫৭)

আদব ছাড়া ইলম শোভনীয় নয়

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রাযি. বলেন:

وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ لَا يَنْبُلُ الرَّجُلُ بِنَوْعٍ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يُزَيِّنْ عَمَلَهُ بِالْأَدَبِ رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي تَارِيخِهِ. (الآداب الشرعية: ٥٥٧، ج: ٣)

মানুষ ইলম দ্বারা ততক্ষণ পর্যন্ত সম্মানিত হতে পারে না, যতক্ষণ না সে তার আমলকে আদব দ্বারা সজ্জিত করে নেয়। (আল-আদাবুশ শারইয়্যাহ–খ.৩, পৃ.৫৫৭)

জাহান্নাম থেকে বাঁচতে চাইলেও আগে আদব শিখো

وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – فِي قَوْلِه تَعَالَى[يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا] ﴿التحريم: ٦﴾ قَالَ أَدِّبُوهُمْ وَعَلِّمُوهُمْ (الآداب الشرعية: ٥٥٧، ج: ٣)

হযরত আলী রাযি. কুরআন কারীমের আয়াত–(সূরা তাহরীম: ৬) -এ বর্ণিত:"তোমরা নিজেদেরকে এবং পরিবারের লোকদের জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও"–এই কথার ব্যাখ্যায় বলেন: অর্থাৎ তোমরা আদব ও ইলম শিখো। এবং এর মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তির উপায় খুঁজো। (আল-আদাবুশ শারইয়্যাহ–খ.৩, পৃ.৫৫৭)

আদব ছাড়া বেশি হাদীস শেখাও কাম্য নয়

وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ لِي مُخَلَّدَةُ بْنُ الْحُسَيْنِ نَحْنُ إِلَى كَثِيرٍ مِنَ الْأَدَبِ أَحْوَجُ مِنَّا إِلَى كَثِيرٍ مِنَ الْحَدِيثِ. (الآداب الشرعية: ٥٥٨، ج: ٣)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. বলেন, আমাকে হযরত মুখাল্লিদ ইবনে হুসাইন রহ. বলেন: আমরা অধিক হাদীস সংগ্রহের চেয়ে অধিক পরিমাণ আদবের মুখাপেক্ষী। (আল-আদাবুশ শারইয়্যাহ–খ.৩, পৃ.৫৫৮)

হযরত হাবীব ইবনে শাহীদ রহ. (যিনি ইবনে সীরীন রহ. এর শাগরেদ) তিনি নিজের সন্তানকে বলতেন: 'বৎস, ওলামা ও ফুকাহায়ে কেরামের মজলিসে বসে তাদের থেকে আদব শিখো। এটি আমার কাছে (আদবহীন) অনেক বেশি হাদীস জানা থেকে উত্তম।

উচ্চতর স্তরের শিক্ষার্থীদের আরো বেশি বিনয়ী হওয়া চাই (১)

وَرَأَى الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ قَوْمًا مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ بِهِمْ بَعْضُ الْخِفَّةِ فَقَالَ: هَكَذَا تَكُونُونَ يَا وَرَثَةَ الْأَنْبِيَاءِ؟

হযরত ফুযাইল ইবনে ইয়ায রাযি. হাদীস পড়তে আসা শিক্ষার্থীদের মাঝে আদবের বিষয়ে কিছু অসংগতি দেখলেন, সাথে সাথে সতর্ক করে বললেন: নবীর ওয়ারিশগণ, তোমরা এমন থাকবে? (আল-আদাবুশ শারইয়্যাহ–খ.১, পৃ.২৪৩)

وَسَمِعَ وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ كَلَامَ أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ وَحَرَكَتَهُمْ، فَقَالَ: يَا أَصْحَابَ الْحَدِيثِ مَا هَذِهِ الْحَرَكَةُ عَلَيْكُمْ بِالْوَقَارِ.

হযরত ওয়াকী' ইবনুল জাররাহ রহ. হাদীস পড়তে আসা শিক্ষার্থীদের অনুপোযুগী কোনো কথা ও আচরণ লক্ষ্য করে, তাদের সম্বোধন করে বললেন: হে হাদীস বিশারদগণ, এটি কেমন আচরণ? তোমাদের জন্য তো গাম্ভীর্যতা আবশ্যক। (আল-আদাবুশ শারইয়্যাহ–খ.১, পৃ.২৪৩)

---

(১) অত্যন্ত দুঃখজনক ভাবেই লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, দ্বীনি মাদরাসার তালিবুল ইলম ভাইদের মাঝে এমন প্রবণতা তৈরি হয়েছে যে, যত বড়ো হচ্ছেন, তারা ততবেশি পরওয়াহীন হয়ে উঠছেন। তথা নিজেকে আদবহীন ভাবে প্রকাশ করাকে গৌরব মনে করছেন। নিজের দায়িত্বের বাইরে গিয়েও প্রতিবাদমূখর হয়ে উঠছেন। এবং তা আসাতেযায়ে কেরাম ও মাদরাসার বিরুদ্ধেই। নাউযুবিল্লাহ। এই জাহালতের কোনো উযর আছে? এই সময়ে তো বয়সের সাথে সাথে আদবও বাড়ার কথা ছিল!

শুধু আদাব শেখার জন্যই দীর্ঘ সফর!

وَقِيلَ لِابْنِ الْمُبَارَكِ أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ: إِلَى الْبَصْرَةِ، فَقِيلَ لَهُ مَنْ بَقِيَ؟ فَقَالَ ابْنُ عَوْنٍ آخُذُ مِنْ أَخْلَاقِهِ آخُذُ مِنْ آدَابِهِ.

একদা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. সফরে ছিলেন। মানুষরা জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাচ্ছেন? তিনি বললেন: 'বসরায়'। তারা জিজ্ঞেস করল, সেখানে এমন কে বাকি রয়েছেন, যার থেকে আপনার হাদীস নেওয়া বাকি আছে? তিনি বললেন: ইবনে আউন রহ. এর খেদমতে হাজির হওয়ার ইচ্ছা করেছি। তার কাছ থেকে আদব ও আখলাক শেখার ইচ্ছা করেছি। (আল-আদাবুশ শারইয়্যাহ–খ.১, পৃ.২৪৩)

শুধু জ্ঞান নয়, আদব শেখার জন্যও উস্তাদের সোহবতে যাওয়া

وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ: كُنَّا نَأْتِي الرَّجُلَ مَا نُرِيدُ عِلْمَهُ لَيْسَ إِلَّا أَنْ نَتَعَلَّمَ مِنْ هَدْيِهِ وَسَمْتِهِ وَدَلِّهِ.

আব্দুর রহমান ইবনে মাহদি রহ. বলেন: আমরা কিছু ওলামায়ে কেরামের নিকট গমন করতাম শুধু ইলম শেখার জন্য নয়, বরং তাদের উত্তম চরিত্র, আচার-আচরণ ও চলন-বলনের ধরন শেখার জন্য।

وَكَانَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ يَحْضُرُونَ عِنْدَ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ مَا يُرِيدُونَ أَنْ يَسْمَعُوا شَيْئًا إِلَّا يَنْظُرُوا إِلَى هَدْيِهِ وَسَمْتِهِ.

হযরত আলী ইবনে মাদিনী রহ.-সহ যুগের আরো বড়ো বড়ো কতিপয় ইমামগণ ইয়াহইয়া ইবনে সায়ীদ আল-কাত্তানের কাছে মাঝে মাঝে শুধু এই জন্য আসতেন যে, তার আখলাক ও আচার-আচরণ প্রত্যক্ষ করবেন।

وَعَنْ الْأَعْمَشِ قَالَ: كَانُوا يَتَعَلَّمُونَ مِنْ الْفَقِيهِ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى لِبَاسَهُ وَنَعْلَيْهِ.

হযরত আ'মাশ রহ. থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন: ফিকহের শিক্ষার্থীরা উস্তাদ থেকে প্রতিটি বিষয় শিখতেন। এমনকি জামা ও জুতা পরিধান করা পর্যন্ত।

হযরত ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. এর মজলিসে পাঁচ হাজারের অধিক শিক্ষার্থী শরীক হত। সেখান থেকে আনুমানিক পাঁচশত শিক্ষার্থী হাদীস লিখত। বাকী সবাই উত্তম চরিত্র, আদব-আখলাক, দৃঢ়তা ও ধীরস্থিরতার সবক নিত! (আল-আদাবুশ শারইয়্যাহ: খ.১৩, পৃ. ১৩) [চলবে...]

সর্বব্যাপী বিপর্যয়:

আসুন নীড়ে ফিরি

-মুফতি সিদ্দীকুর রহমান সাহেব

ইতিহাস স্বীকৃত কথা হলো, রসূলুল্লাহ স. যখন পৃথিবীতে আগমন করেছেন, তখন সমগ্র পৃথিবী ব্যাপক অস্থিতিশীল ছিল। ভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত ছিল। ইনসাফ ও হিদায়তে কোনো আলোকরশ্মী ছিল না। ওই মুহূর্তে তিনি আগমন করে পুরো পৃথিবীকে আলোকিত করে তুলেছিলেন। স্থিতিশীল ও ইনসাফপূর্ণ একটি সমাজে রূপান্তর করে ফেললেন। আল্লাহ তাআলা কুরআন কারীমে সে কথাই বললেন:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾[الأنبياء:١٠٧]

অর্থ: আমি আপনাকে পাঠিয়েছি বিশ্ববাসীর জন্য রহমতের কাণ্ডারি করে। (সূর–আম্বিয়া-১০৭)

এই অন্ধকারচ্ছন্ন সমাজে আলো ফোটাতে নবীজি নিজের মেধা, শ্রম ও আল্লাহর দেওয়া সাহায্য পুরোপুরি কাজে লাগান। মানুষের দ্বারে দ্বারে হিদায়াতের বাণী পৌঁছে দেন। যার ফলে একটি ঘাতক সমাজ একটি কল্যাণ সমাজে রূপান্তর হলো। মানুষগুলো হয়ে উঠলেন সুসভ্য। জুলুম অনাচার যেন সমূলে উৎখাত হলো।

আজ ইতিহাস সে সময়কে "সোনালি যুগ" নামে স্মরণ করে। খোদ রসূলুল্লাহ স. ও সেই যুগটিকে শ্রেষ্ঠ যুগ হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন। ইরশাদ করেছেন:

خَيْرُ الناس قَرْني

অর্থ: সর্বোত্তম যুগ হলো আমার যুগ....। (বুখারি-২৬৫২, মুসলিম–২৫৩৩) আমরা যদি এর পেছনের কারণ খুঁজি, তাহলে একটাই মৌলিক কারণ বের হবে। তা হলো রসূলের আদর্শের পরিপূর্ণ অনুসরণ। আজ পৃথিবী আবার আগের ন্যায় অস্থিতিশীল হয়ে উঠেছে। নিরাপত্তা বলতে কিছুই নেই। জান, মাল, ইজ্জত-আবরু, সন্তান-সন্ততি কোনো কিছুরই নিরাপত্তা নেই। এর পরিত্রান খুঁজলে সেই একটি পথই বের হবে, তা হলো রসূলের আদর্শে পুণঃ প্রতিষ্ঠিত হওয়া। আমরা রসূলের আদর্শ আকড়ে ধরার কারণে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলাম। এখনও শান্তি পেতে হলে রসূলের আদর্শে ফিরে যেতে হবে। আসুন নীড়ে ফিরে যাই।

লেখক, ইমাম ও খতীব, আবু তাহের জামে মসজিদ, দক্ষিণখান, উত্তরা।

সুখবর!

দারুল ইলমে "নে'মাল বায়ানের" দারস চলছে

'নে'মাল বায়ান' প্রকাশ হওয়ার পর হয়তো দারুল ইলমই এই সৌভাগ্য অর্জন করেছে যে, সে সবার আগে এটিকে সিলেবাসভূক্ত করে নিয়েছে। মূলত 'নে'মাল বায়ান' ওলামা-ত্বলাবার বহুল কাঙ্খিত একটি সংকলন। এর যথাযথ প্রচার এখনও হয়ে উঠেনি। অনেকে বাহরুল উলূম নেআমত উল্লাহ আজমি হাফি. -এর রচনা বলে নাম শুনলেও এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা না থাকায় এর থেকে ইস্তিফাদা করার এখনও ভাগ্যে জুটছে না। আবার ব্যাপক প্রচার-প্রসার না হওয়ায় এটি হাতের কাছে পাওয়াও যায় না। তবে আমরা জোরদার আশাবাদী যে, আল্লাহ চাহে তো একদিন 'নে'মাল বায়ান' উপমহাদেশের প্রতিটি দারসগাহ আলোকিত করে তুলবে। এবং কুরআন কারীমের অনুবাদ ও তাফসীর চর্চার নতুন যুগের সুচনা করবে। এবং যোগ্যরাই এর দারসের সুযোগ পাবেন। কারণ নীতিমালা অনুযায়ী এটি পড়ে বুঝা ও এবং সে অনুযায়ী কুরআন অনুবাদের অনুশীলন করানো চাট্টিখানি কথা নয়।

কৃতজ্ঞতা

আমরা সর্বপ্রথম কৃতজ্ঞতা আদায় করছি দারুল ইলমের পরিচালনা বিষয়ক উপদেষ্টা ডা. মুফতি মাহমুদ কাসিমি হাফি.-এর। দারুল ইলম চলতি শিক্ষাবর্ষে হেদায়া জামাতের তালিবুল ইলমদের জন্য কুরবানি পর্যন্ত সিলেবাস সেমিস্টারে নে'মাল বায়ানের দারস প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিন্তু মাদরাসার এই সামর্থ্য ছিল না যে, বাংলাবাজার থেকে এক সেট নে'মাল বায়ান ক্রয় করবে। এটি শুনার সাথে সাথে ডাক্তার সাহেব এক সেট নে'মাল বায়ানসহ আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ কিতাব দারুল ইলমে পৌঁছে দেন। জাযাহুল্লাহু তাআলা আহসানাল জাযা।

খোদ 'সংকলকের' দারস!

অধমের জানা মতে নে'মাল বায়ান সংকলনের অভিপ্রায় বাহুরুল উলূম হাফি. এর অনেক পুরোনো। কিন্তু আস্থাভাজন সহযোগী না পাওয়ায় তা কয়েকবার শুরু হয়েও বন্ধ হয়ে যায়। আখের হযরত মাওলানা মুফতি মারুফ মুজিব ফেনবি হাফি. হযরতের সেই শুন্যতা পূরণ করতে সক্ষম হয়েছেন, আলহামদুলিল্লাহ। নে'মাল বায়ানের কাজ মুফতি মারুফ সাহেবের হাত ধরেই স্থায়ীভাবে শুরু হয়। আমাদের জন্য সৌভাগ্য হলো: দারুল ইলমে নে'মাল বায়ানের প্রথম সবক মারুফ সাহেব হুজুরই প্রদান করেছেন।

আরও সৌভাগ্য হলো, এর একদিন পর দারুল ইলমে তাশরীফ আনেন নে'মাল বায়ানের দ্বিতীয় মুরাত্তিব, মাও. আশরাফ লুৎফি বগুড়াবি। মুফতি মারুফ সাহেব নে'মাল বায়ানের পনেরো পারা কাজ শেষ করার পর মুরব্বিদের আদেশে বাংলাদেশে ফিরে এলে পরবর্তী তারতীবের কাজ আশরাফ লুৎফি সাহেব আঞ্জাম দেন। দারুল ইলম তাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে।

দারুল ইলমেও নে'মাল বায়ানের দাবি অনুযায়ী কুরআন কারীমের অনুবাদের অনুশীলনের কাজ চলছে। কাজের কিছু নমুনা এখানে ছাপা হলো। নে'মাল বায়ানের **দারস দিচ্ছেন: মাওলানা হুসাইন আলহুদা**, আর **তারতীবের কাজ করছেন, হিদায়া জামাতের মু. রাশেদুল ইসলাম।**

কিতাব পরিচিতি

নাম: (نعم البيان في ترجمة القرآن) নে'মাল বায়ান ফী তারজামাতিল কুরআন। (দুই খণ্ড)

সংকলন: বাহরুল উলূম হযরত মাওলানা নেআমত উল্লাহ আজমি হাফিযাহুল্লাহ।

তারতীব: মাওলানা মারুফ মুজিব ফেনবি হাফি., মাওলানা শুআইব আলিগড়ি হাফি., মাওলানা আশরাফ লুৎফি বগুড়াবি হাফি.।

বিষয়বস্তু: তারজামাতুল কুরআন (তথা কুরআন কারীম অনুবাদ অনুশীলন।)

প্রথম প্রকাশ: (পূর্ণাঙ্গ) ২০২১ ঈ., মুতাবিক ১৪৪২ হি.।

প্রকাশক: মাকতাবায়ে নে'মাত, দেওবন্দ।

পরিবেশক: মাকতাবাতুল হারামাইন দেওবন্দ।

বিষয়বস্তু পরিচিতি:

কুরআন কারীম সমগ্র বিশ্বের হিদায়াত স্বরূপ অবতীর্ণ হয়েছে। এবং কিয়ামত পর্যন্ত আর কোনো কিতাব অবতীর্ণ হবে না। এক কথায় বললে: কিয়ামত পর্যন্ত বিশ্ববাসীর জন্য কুরআনুল কারীমে পূর্ণাঙ্গ হিদায়াত রয়েছে। কুরআন কারীম চির অভিনব। যে কারোর জন্য, যে কোনো পরিস্থিতিতে কুরআন কারীম চূড়ান্ত সমাধান। তাই কুরআন কারীমকে বুঝা ও অনুধাবন করা সর্বাগ্রে গুরুত্বপূর্ণ। তবে কুরআন কারীম আরবি ভাষায় অবতীর্ণ হলেও সাধারণ যে কোনো পুস্তকের মতো কুরআনকে তুলনা করা যাবে না। কারণ কুরআন কারীমের আলাদা মাহাত্ম্য রয়েছে। প্রতিটি শব্দে ও ছত্রে এই মাহাত্ম্য ঠিক রেখেই তার মর্ম উদ্ধারের চেষ্টা করতে হয়। কুরআনের কোন্ শব্দের কী অর্থ, কোন বাক্য দ্বারা কী উদ্দেশ্য, তা রসূলুল্লাহ স. থেকে সিলসিলাগত-ভাবে আসা নিরাপদ মতটিই গ্রহণ করতে হয়। এই নীতিমালা সামনে রেখেই কুরআন কারীমের অনুবাদ করতে হয়। তাই বলতে হয়, কুরআন কারীমের অনুবাদের জন্য ব্যাপক প্রস্তুতির প্রয়োজন। আর সে প্রস্তুতিও হতে হবে কোনো প্রাজ্ঞ ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে। আর এভাবেই চৌদ্দশত বছর ধরে উম্মত কুরআন কারীমের অনুবাদ করে আসছে। আমাদের উপমহাদেশের ওলামায়ে কেরামও কুরআন কারীমের অনুবাদ ও তাফসীর নিয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। এর মাঝে উল্লেখযোগ্য হলো শাহ ওয়ালি

উল্লাহ রহ. এর অনুবাদ– 'ফাতহুর রহমান', শাহ আব্দুল কাদের রায়পুরি রহ. -এর অনুবাদ 'মূযিহুল কুরআন', এবং এই দুই তারজামার সংস্করণ করতে গিয়ে হযরত শাইখুল হিন্দ রহ. প্রণয়ন করেন যুগের অনুপম আরেক অনুবাদ, যা 'তারজামায়ে শাইখুল হিন্দ' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে এবং তাতে টিকা লিখেন 'হযরত শিব্বির আহমদ উসমানি রহ.। দুইয়ে মিলে তা হয়ে উঠে 'কুরআন অনুধাবনের' জন্য যুগের রুচিশীল ওলামায়ে কেরাম সর্বাধিক আস্থাভাজন দস্তাবেজ। এর মাঝে আরো দুজন দেওবন্দী মনীষীর অনুবাদ প্রকাশিত হয়, সেগুলোও স্বাতন্ত্র্যে অনুপম এবং দুনোটি অনুবাদই হযরত শাইখুল হিন্দ রহ. কর্তৃক নিরীক্ষিত। একটি হলো: হযরত থানবি রহ. এর 'বায়ানুল কুরআন' আরেকটি হলো হযরত আশেক এলাহি মিরাটি রহ. এর 'হামায়েল'। এরপরের প্রজন্মে হযরত মুফতি শফি রহ.-এর 'মারিফুল কুরআন' ও হযরত ইদ্রিস কান্ধলবি রহ. এর একই নামে অনুবাদ ও তাফসীর 'মাআরিফুল কুরআন' প্রসিদ্ধি লাভ করে। এরপরের তবকা তথা হালযামানার মনীষীদের মাঝে হযরত মুও. মুফতি সাঈদ আহমদ পালনপুরি রহ. এর 'হিদায়াতুল কুরআন' ও মুফতি তাকি উসমানি রহ. এর 'আসান তারজামায়ে কুরআন' প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। আর এই ধারাকে আরো সুসংহত ও বেগমান করতে যুক্ত হলো– যুগের অনুপম প্রতিভা ও সালাফের জীবন্ত স্মৃতি, মুহাক্কিকুয যামান, বাহরুল উলূম আল্লামা নেআমত উল্লাহ আজমি হাফি. এর- 'নে'মাল বায়ান ফী তারজামাতিল কুরআন।'

নে'মাল বায়ান একটি জাগরণ চায়:

নে'মাল বায়ান সংকলনের যে প্রতিপাদ্য ও নীতিমালা গ্রহণ করা হয়েছে, এর প্রেক্ষাপট হলো: কুরআন কারীম বিশ্ববাসীর জন্য একমাত্র হিদায়াতের কিতাব হওয়ার কারণে পৃথিবীর প্রতিটি ভাষায়ই এর অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কুরআন কারীরেম অনুবাদ যেহেতু গতানুগতিক নয়, এর জন্য প্রয়োজন রয়েছে ব্যাপক অনুশীলনের। এবং কুরআনের তা'লিম ও দাওয়াত যথাযথ জিইয়ে রাখতে প্রতি প্রজন্মের একটি দল বিশেষত ওলামায়ে কেরামকে কুরআনের অনুবাদ ও তাফসীর করার দক্ষতা অর্জন করতে হবে। এবার যদি সমীক্ষায় আসি, এবং প্রথমে উপমহাদেশের প্রতি লক্ষ্য করি, তাহলে দুঃখজনক ভাবে একটি শুন্যতা অনুভব হচ্ছে যে, এখানকার আকাবিরগণ কুরআন কারীম নিয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ করে গেলেও চলমান প্রজন্ম এই বিষয়ে বড়ো ধরণের গাফলতিতে নিমজ্জিত। বরং হাতেগোণা দুয়েকজনও তৈরি হচ্ছে না, যারা দক্ষতার সাথে কুরআন কারীমের অনুবাদ করতে পারবে। বরং আকাবিরদের তরজামা নিয়েই সবাই যেন আত্মতুষ্টিতে নিমজ্জিত। অথচ আগের তুলনায় কুরআন কারীমের পাঠদান বর্তমান সিলেবাসে অনেক বেশি। এখন প্রায় মাদরাসায় তাফসীর বিভাগ রয়েছে। প্রয়োজন ছিল প্রতিটি তাফসীর বিভাগ থেকে প্রতি বছর একটি করে অনুবাদ প্রকাশ হওয়া। নে'মাল বায়ান সংকলনের একটি কারণ এই শুন্যতা দূর করা। তাতে তরজামায় দক্ষতা তৈরির যথেষ্ট রাহনুমায়ী রয়েছে।

'ঈজায বিল হাযফ' নির্ণয়:

নে'মাল বায়ানের আরেকটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, তারজামাতুল কুরআন করতে গিয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হলো কুরআন কারীমে ব্যবহৃত الإيجاز بالحذف 'ঈজায বিল হাযফ' -গুলো উল্লেখ করে অনুবাদ করা। এতে কুরআন কারীমের মূল বার্তা বুঝতে বেশি সহায়ক হয়। আর 'ঈজায বিল হাযফ' হলো– আরবি ভাষার বালাগাত শাস্ত্রের নীতিমালাভিত্তিক ভাষাকে প্রাঞ্জল করে উপস্থাপন করার জন্য 'বাক্য সংক্ষেপন করা।' এতে ভাষার সুকুমারিত্ব প্রকাশ পায়। যেহেতু কুরআন কারীম আল্লাহ তাআলার কালাম, এটি বালাগাত শাস্ত্রের সর্বোচ্চ পর্যায়ে উত্তীর্ণ হওয়াটাই স্বাভাবিক। তাই কুরআন কারীমে 'ঈজায বিল হাযফের' অনেক বেশি ব্যবহার রয়েছে। অনুবাদ করার সময়ে এই বিষয়টি যত বেশি লক্ষ্য করা যাবে, অনুবাদ তত বেশি উৎকৃষ্ট হবে।

তবে বিষয়টি অনেক কঠিন বটে। কুরআনের আয়াতে কোন শব্দ উহ্য আছে, তা অনুমান করা সবার পক্ষে তো সম্ভব নয়ই। বিজ্ঞ ওলামায়ে কেরামের পক্ষেও অনেক কঠিন। এই বিষয়ে 'তারজামায়ে শাইখুল হিন্দে' অল্প বিস্তর ইশারা করা হয়েছে। হযরত থানবি রহ. বায়ানুল কুরআনে (نكات ترجمة) শিরোনাম এই বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। কুরআন কারীমের অনুবাদের জন্য এ বিষয়ে স্বতন্ত্র কোনো সংকলন এ যাবত হয়নি। শত শত বছর ধরে ওলামায়ে কেরাম এমন কোনো গ্রহণযোগ্য ও শক্তিশালী কাজের অপেক্ষায় ছিলেন। নে'মাল বায়ান সে প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ। আর যিনি এই কাজটি সম্পাদন করেছেন, তার ব্যাপারে যুগের আহলে ইলম ওলামায়ে কেরাম পূর্ণ আস্থা রাখেন এবং এই কাজের যোগ্য তাকেই মনে করেন। আল্লাহ তাআলা একে আগত উম্মতের জন্য নেহায়ত মুফীদ বানান। সংকলককে জাযায়ে খায়ের দান করুন। আমাদের উপর তাঁর ছায়া দীর্ঘ করুন।

দারুল ইলমে অনুবাদ অনুশীলন:

নে'মাল বায়ানের দেখানো নীতিমালা অনুসরণ করে দারুল ইলমে এই বছর হিদায়া জামাতের ছাত্রদের নিয়ে কুরআন কারীমের অনুবাদ অনুশীলন শুরু হয়েছে। আমাদের জন্য আনন্দের বিষয় হলো নে'মাল বায়ানের বাংলাদেশী দুইজন মুরাত্তিব–মুফতি মারুফ মুজিব হাফি. ও মাওলানা আশ্রাফ লুৎফি সাহেবান দারুল ইলমে নিয়মিত আসা-যাওয়া করছেন, আলহামদুলিল্লাহ। বিশেষত হযরত মাওলানা মুফতি মারুফ মুজিব হাফি. নে'মাল বায়ানের দারস ও অনুবাদ-অনুশীলনের বিশেষ তত্ত্বাবধান করবেন বলে আশা প্রদান করেছেন। জাযাহুমুল্লাহু তাআলা আহসানাল জাযা।

এই বছর কুরবান পর্যন্ত সূরা কাহফের অনুবাদ সিলেবাসে রাখা হয়েছে। এটি একটি অস্থায়ী ও আপেক্ষিক সংযোজন। কারণ হিদায়া জামাতে সাধারণত তারজামায়ে কুরআন নেই। নিচে শুভানুধ্যায়ীদের দোয়া ও পরামর্শ কামনা করে প্রাথমিক খসড়া হিসেবে ১৫ আয়াতের অনুবাদ ও নির্বাচিত কিছু টিকা দেওয়া হলো।

সূরা কাহাফ। (আয়াত: ১-১৫)

١. الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا.

٢. قَيِّمًا لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا.

٣. مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا.

٤. وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا.

٥. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا.

٦. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا

٧. إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا.

٨. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا.

٩. أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا.

(১) (২) সকল প্রশংসা ওই আল্লাহর জন্য, যিনি নিজ বান্দার প্রতি এমন একটি কিতাব[১] নাজিল করেছেন, যা সরল-সঠিক ও মধ্যপন্থী[২] এবং তাতে কোনো ধরণের বক্রতা রাখেননি; এক কঠিন শাস্তির ভয় প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে, যা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নির্ধারিত, এবং সৎকর্মশীল মানুষকে এই সুসংবাদ দেওয়ার জন্য যে, তাদের জন্য উত্তম প্রতিদান (জান্নাত) রয়েছে।

(৩) যাতে তারা সর্বদা থাকবে।

(৪) (৫). এবং সে সমস্ত লোকদের সতর্ক করার জন্য, যারা বলে আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন। তাদের কাছে এই কথার কোনো দলিল নেই এবং তাদের বাপ-দাদাদের কাছেও না। অতি গুরুতর কথা, যা তাদের মুখ থেকে বের হচ্ছে, তারা মিথ্যা ছাড়া কিছুই বলছে না।

(৬) আপনি যেন আক্ষেপে তাদের পেছনে নিজের প্রাণনাশ করে ফেলবেন, যদি তারা এই কুরআনের বাণীর উপর ঈমান না আনে! (অর্থাৎ এত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবেন না) [৩]

(৭) এজন্য যে জমিনে যা কিছু আছে, সেগুলোকে আমি পৃথিবীর জন্য শোভাকর বানিয়েছি, যাতে লোকদের পরীক্ষা করে দেখি তাদের কে ভালো কাজ করে।[৪]

(৮) এবং আমি জমিনের উপরের সবকিছুকে (উৎখাত করে) সমতল ভূমিতে রূপান্তর করব[৫]।

(৯) আপনি কি মনে করেছেন যে[৬], [৭] গুহা ও রকীমবাসীরা[৮] আমার বিস্ময়কর নিদর্শনাবলির তেমন কোনো আশ্চর্যের বিষয় ছিল?

(এখানে নে'মাল বায়ানের সবগুলো টিকা সংযোজন করা হচ্ছে না। নমুনস্বরূপ সংক্ষিপ্ত কয়েকটি টিকা দেওয়া হলো)

(১).....

(২) (قَيِّمًا: أي جعله قيما. أي الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب قيما ولم يجعل له عوجا) قَيِّمًا–অর্থ: সরল ও মধ্যপন্থী।

(৩) فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ (যেন আপনি তাদের পিছনে নিজের প্রাণনাশ করে ফেলবেন) অর্থাৎ কিয়ামত সংঘটিত হবে। হিসাব কিতাব হবে। হিসাবের ফয়সালা অনুযায়ী মানুষ জান্নাত-জাহান্নামে যাবে। আর যেহেতু এই পৃথিবী পরীক্ষার জায়গা,তাই স্বভাবত কেউ সফল হবে, কেউ ব্যার্থ হবে। এখন কেউ যদি কুফরি করার কারণে ব্যর্থ হতে থাকে, তাহলে তার জন্য এত আপসোস না করা চাই যে, মানুষ নিজের জীবন দিয়ে ফেলবে! (অর্থাৎ হে রসূল, আপনি কাফেরদের ঈমান না আনার কারণে এত বিচলিত হবেন না। তারা ইচ্ছা করেই এমন করছে।)

(৪).....

(৫) صَعِيدًا جُرُزًا : (جُرُزًا- ن)-হলে অর্থ হবে– কাটা, মূল থেকে উৎখাত করা। (جُرُزًا- س) হলে হবে জমি অনুর্বর হওয়া। ঘাস কর্তিত হওয়া। (الجَرَزُ بفتح الجيم والراء) হলে অর্থ হয় জমি অনুর্বর হওয়া। (এখানে যেহেতু (جُرُزًا) তাই প্রথম অর্থ–'উৎখাত করে ফেলা' নেওয়া হয়েছে।)

(৬) أَمْ حَسِبْتَ (আপনি কি মনে করেন?) এখানে (أم) অব্যয়টি (الإستفهام الإنكارية) এর অর্থে। অর্থাৎ অস্বীকারমূলক প্রশ্নসূচক অব্যয়। অর্থাৎ "আমার বিস্ময়কর সৃষ্টিকুলের মাঝে 'আসহাবে কাহ্‌ফ' থেকেও বড়ো বিস্ময়কর বস্তু রয়েছে। ইহুদিরা তো মক্কাবাসীর কাছে বলল: মুহাম্মদ স.-কে সেই বড়ো বিস্ময়কর ঘটনাটি জিজ্ঞেস করো!" তাই তাচ্ছিল্য করে (أَمْ حسبتَ)-এভাবে বলা হয়েছে।

١٠. إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا.

(১০) যখন সেই যুবকগুলো এই গর্তে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। অতঃপর তারা প্রার্থনা করে বলল: হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের প্রতি আপনার পক্ষ থেকে রহমত প্রেরণ করুন। এবং আমাদেরকে এই বিষয়ে সফলতা দান করুন।(৯)(১০)

١١. فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا.

(১১) আমি গর্তের মধ্যে তাদের কানের উপর কিছু কালের জন্য ঘুমের পর্দা টেনে দিয়েছি।(১১)

١٢. ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا.

(১২) অতঃপর আমি তাদেরকে জাগালাম, এ কথা লক্ষ্য করার জন্য যে, তাদের দুই দলের কোন দলটি নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে বেশি অবগত।(১২)

١٣. نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى.

(১৩) আমি আপনার কাছে তাদের ঘটনা বিশুদ্ধভাবে বর্ণনা করছি। তারা কয়েকজন যুবক ছিল যারা নিজেদের প্রভুর প্রতি ঈমান এনেছে, আর আমি তাদের হিদায়াতে উৎকর্ষতা দান করেছি।

١٤. وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا.

(১৪) এবং আমি তাদের অন্তরকে দৃঢ় করে দিয়েছিলাম, যখন তারা (রাজার সামনে) উঠে দাঁড়িয়েছিল। অতঃপর বলেছিল, আমাদের প্রভু আকাশমণ্ডলি ও ভূপৃষ্ঠের প্রভু। আমরা তাকে ছেড়ে দিয়ে অন্য কাউকে উপাস্য হিসেবে ডাকব না। কেননা আমরা যদি অন্য কাউকে উপাস্য হিসেবে ডাকি, তখন আমরা অবাস্তব কথাই বলব(১৩)

١٥. هَؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا.

(১৫) এই আমাদের সম্প্রদায়, তারা আল্লাহ তাআলাকে ছেড়ে অন্যান্যদের উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে! কেনো তারা এদের উপাস্য হওয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্ট কোনো প্রমাণ পেশ করেনা? সুতরাং ওই ব্যক্তির চেয়ে বড়ো জালেম কে হতে পারে, যে আল্লাহর উপর মিথ্যা অপবাদ দেয়!

---

(৭) (أَمْ حَسِبْتَ) : মক্কার সরদাররা মদীনার ইহুদি আলেমদের কাছে দুই জন লোক পাঠাল, রসূলুল্লাহ স. নবুওয়াতের দাবি সম্পর্কে হুইদিরা কি বলে, তা জানার জন্য। ইহুদি আলেমরা বলল, তোমরা হযরত মুহাম্মদ স. এর কাছে ৩ টি প্রশ্ন উত্থাপন করবে। যদি তিনি সেগুলোর সঠিক উত্তর দিতে পারেন, তাহলে মনে করে নিবে যে তিনি সত্য নবী। আর যদি তিনি সঠিক উত্তর না দিতে পারেন, তাহলে মনে করে নিবে যে, তাঁর নবুওয়াতের দাবি সঠিক নয়। প্রথম প্রশ্ন ছিল:

(ক)–কতক যুবকের সেই বিস্ময়কর ঘটনা কি, যারা নিজেদের কুফর-শিরক থেকে বাঁচানোর জন্য নিজেদের শহর ছেড়ে কোনো গর্তে আত্মগোপন করেছিল।

(খ)– ওই ব্যক্তির কথা জিজ্ঞেস করবে, যিনি পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত পুরো পৃথিবী ভ্রমণ করেছেন।

(গ)–রূহ-এর বাস্তবতা কি?

ওই দুজন লোক মক্কায় ফিরে এল। মক্কাবাসীদের ইহুদিদের প্রস্তাব শুনাল। পরে তারা নিজেদের লোকজন নিয়ে রসূলুল্লাহ স. এর দরবারে উপস্থিত হলো। এবং প্রশ্ন তিনোটি উত্থাপন করল। (তাদের জবাবে) এই সূরায় আত্মগোপনকারীদের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। তাদের 'আসহাবে কাহ্‌ফ' বলা হয়। আরবি ভাষায় 'কাহ্‌ফ' শব্দের অর্থ হলো– গর্ত। (আসহাবে কাহ্‌ফ-অর্থাৎ গর্তের অধিবাসী।) আর পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত ভ্রমণকারীর ঘটনাও এই সূরায় বর্ণনা করা হবে। তার নাম হলো 'যুলকারনাইন।' রূহ সম্পর্কে এর পূর্বের সূরা (সূরা ইসরায়) বর্ণনা করা হয়েছে।

(৮) أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ: এখানে (الْكَهْف)-এর অর্থ হলো- গর্ত। এবং (الرَّقِيم)-এর অর্থ সম্পর্কে মতানৈক্য রয়েছে। (ক)– কোনো কোনো গবেষক বলেন, আসহাবে কাহাফের ঘটনার পর তাদের গর্তের সামনে তাদের নামের ফলক লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল, এ জন্য তাকে رقيم বলে। (খ)–কেউ বলেন, আসহাবে কাহাফ যে গর্তে অবস্থান করেছে, সে গর্তেরই কোনো অংশের নাম ছিল। যাকে رقيم (পাহাড়) বলা হত।

(৯) وَهَيِّئْ لَنَا : (وهيأ فلان الأمر) : ঠিক করা। সহজ করা।

(১০) مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا: (رشد أمره–س) : কার্যক্রম সঠিক হওয়া। কামিয়াব হওয়া। "فهو رشيد"

প্রাচীন চট্টগ্রাম বন্দর। তখন তো উড়ো জাহাজ ছিল না। ছিল শুধু পানির জাহাজ। বিদেশি অতিথিরা এই বন্দর দিয়েই আসতেন আমাদের প্রিয় ভূমিতে।

বাঙ্গলায় অতিথি ভাষা

- ইফতিখারুল হক খাইর

কবি নজরুল বাংলায় হাফিজ-খৈয়ামের ফারসি কবিতার কাব্যানুবাদ করে পারস্যের প্রেমময় আবহকে বাংলা সাহিত্যে এনে একে পরিপূর্ণ করে দিতে চেয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন ইরানের গোলাব ও নার্গিসের সুবাস বাংলার যুঁই-চম্পা-চামেলীর বাগানে ছড়িয়ে বাংলাকে আরও সমৃদ্ধ করতে।

ভাষার বৈচিত্র্য ও উৎপত্তিঃ

ইসলামের দৃষ্টিতে ভাষার বৈচিত্র্য আল্লাহ তাআলার এক মহান কুদরত। কুরআন কারিমে আল্লাহ তাআলা ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্যকে তাঁর নিদর্শন বলে আখ্যা দিয়েছেন। (সূরা রূম–২২)

গবেষকদের ধারণা, বর্তমানে পৃথিবীর মৃত ও জীবিত যত ভাষা আছে, সেসবের উৎস আফ্রিকার ওইসব প্রাচীন মানুষদের ভাষা। আফ্রিকা থেকে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে তারা ছড়িয়ে পড়লে ধীরে ধীরে আদি ভাষাও বদলাতে শুরু করে। একেক প্রান্তে একেক রকম বদলায়। আর এভাবেই জন্ম হয় নতুন নতুন ভাষা। তখন জনগোষ্ঠীভেদে হতে থাকে ভিন্ন ভিন্ন ভাষাগোষ্ঠী। যেমন: ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠী, এস্ট্রো-এশীয় ভাষাগোষ্ঠী, মালয়-পলিনেশীয় ভাষাগোষ্ঠী ইত্যাদি। তারপর এই ভাষাগুলো থেকে আবার নতুন করে শাখা বের হতে থাকে। মধ্য-এশিয়া ও ইউরোপের লোকেরা আরও পূর্ব দিকে এসে আবাদ হতে থাকলে ইরাক, ইরান ও ভারত ভূখণ্ডে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা থেকে ইন্দো-ইরানীয় ভাষাগোষ্ঠীর জন্ম হয়। এরই একটি শাখা হলো, ইন্দো-আর্য বা ভারতীয়-আর্য। ভারতীয়-আর্য ভাষার তিনটি প্রধান রূপ হলো, বৈদিক ভাষা, সংস্কৃত ভাষা ও প্রাকৃত বা গৌড়ীয় ভাষা। এই ভাষাগুলো মধ্যভারতীয়-আর্য ভাষা হিসেবে পরিচিতি আমাদের বাংলাসহ হিন্দি, পাঞ্জাবি, নেপালি ও বার্মিজ ইত্যাদি ভাষাগুলো মূলত 'প্রকৃত' ভাষারই সন্তান।

বারশ' খ্রিষ্টাব্দ।

তখন 'নদিয়া' ছিল বাংলার রাজধানি। পরিচালনা করতেন 'রাজা লক্ষ্মণসেন।' রাজভাষা হিসেবে ব্যবহার হতো 'গৌড়ীয় ভাষা।' তুর্কি-আফগান বংশোদ্ভূত ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মাদ বিন বখতিয়ার খিলজি রহ. তখন দিল্লি সালতানাতে সেনাপতি ছিলেন। তেরশ' খ্রিষ্টাব্দের শুরুতে তিনি এসে সর্বপ্রথম মুসলিম হিসেবে বিহার ও তারপর বাংলা ভূখণ্ড জয় করেন। তাঁর মাধ্যমে ধীরে ধীরে এ দেশেও ইসলাম ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে।

তাঁর মাতৃভাষা হিসেবে 'ফারসি ভাষা' হয়ে যায় বাংলার রাজভাষা। মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ফারসি ভাষা শিখতে থাকে এবং কবি আল্লামা রুমি ও খৈয়ামের ফারসি সাহিত্যের স্বাদ আহরণ করতে থাকে। তখন আফগান, ভারত, বাংলা; সবার রাষ্ট্রভাষা ছিল ফারসি। ৬০০ বছরের বেশি সময় ধরে ফারসি ভাষা বাংলায় রাজত্ব করে।

তেরশ' খ্রিষ্টাব্দের পর থেকে রাষ্ট্রভাষা ফারসি থাকলেও ধর্মভেদে মানুষেরা অন্যান্য ভাষাও চর্চা করত। যেমন, বৌদ্ধরা পালি ভাষা ও সনাতন ধর্মালম্বীরা সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার করত। তখন ধীরে ধীরে সাধারণ মানুষের কথ্যভাষা হিসেবে বাংলাভাষা গড়ে ওঠতে থাকে। মধ্যযুগে বাংলার সাহিত্যও ছিল শুধুমাত্র ধর্মনির্ভর। দেব-দেবীর আরাধনা ও প্রেম-ভালোবাসা ছিল ওই যুগের সাহিত্যের প্রধান উপকরণ। বাংলা সাহিত্যের আদি মধ্য যুগে বাংলায় লেখা সর্বপ্রথম আখ্যানকাব্য বড়ু চণ্ডীদাস রচিত "শ্রীকৃষ্ণকীর্তণ"। তের খণ্ডবিশিষ্ট এ কাব্যের মূল উপজীব্য হচ্ছে রাধা ও কৃষ্ণের প্রেমকাহিনি। উক্ত কাব্যের একটি পদ এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে–

এক মুখেঁ তোর রূপ কহিতেঁ না পারী।
সর্ব্বাঙ্গে সুন্দরি রাধা মোহিলী মুরারী॥
আলিঙ্গন দিআঁ তোষ নান্দের নন্দনে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী গণে॥

প্রায় সাড়ে ছয়শ' বছর ফারসি ভাষা এই অঞ্চলে রাজত্ব করার ফলে বাংলাভাষায় সবচেয়ে বেশি প্রবেশ করেছে ফারসি শব্দ। ভাষাবিদ ড. শহিদুল্লাহ তার 'বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত' বইতে দাবি করেন যে, বাংলায় সবচেয়ে বেশি আছে ফারসি ভাষার শব্দ। লেখক তাঁর বইয়ের 'বৈদেশিক প্রভাব' পরিচ্ছেদে লেখেন–

"সম্রাট আকবরের কালে বাঙ্গালা দেশ মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। এই সময়ে রাজসরকারের ভাষা ফারসী ছিল... এই দীর্ঘ ৬০০ বৎসরের মুসলমান প্রভাবের ফলে বাঙ্গালা ভাষায় দুই সহস্রের অধিক ফারসী শব্দ এবং ফারসীর মাধ্যমে আরবী ও কিছু তুর্কী শব্দ প্রবিষ্ট হইয়াছে।"

সতেরশ' খ্রিষ্টাব্দ।

ভারত উপমহাদেশে ইংরেজ বেনিয়াদের অনুপ্রবেশ ঘটার পর ধীরে ধীরে তারা ক্ষমতার চেয়ার দখল করে নেয়। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে বাংলার স্বাধীনতারও অবসান ঘটে। তারা মসনদে পূর্ণ অধিষ্ঠিত হয়ে যাওয়ার পর ৬০০ বছর ধরে রাজত্ব করে আসা ফারসির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করল। ততদিনে বাংলাভাষা বেশ ভালোই তরতাজা হয়ে গেছিল। কিন্তু ভূখণ্ড দখলের পর ইংরেজি হয়ে গেল সমগ্র পাক-ভারত-বাংলার রাষ্ট্রীয় ভাষা আর বাংলা ছিল মনিপুর থেকে ওড়িশা এই বৃহৎ অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষা।

১৭৭৪ সাল।

কলকাতায় সুপ্রিমকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হলো। সরকারি ভাষা ইংরেজি বিধায় সুপ্রিমকোর্টের ভাষাও ইংরেজি। উচ্চ আদালতের জজসহ উচ্চপদস্থ সবাই ইংরেজিভাষী। ইংরেজরা এখন শুধু বণিক নয়, তারা রীতিমতো বণিকরাজ। সেই রাজাদের আশীর্বাদ পেতে চাটুকাররা ইংরেজি শিখতে শুরু করল। পুরোনো কেতার ভাত নেই। বণিকরাজের প্রসাদভোগী হওয়ার জন্য হলেও ভাষাটা আয়ত্ব করা প্রয়োজন। প্রথমত চাটুকাররা অনেক কষ্ট করে Yes, No, Very Good পর্যন্তই শিখতে পারে। আর এই সম্বল কাজে লাগিয়েই মনিবের মন জয় করতে থাকে। কিন্তু এই তিন শব্দ দিয়ে তো বড় পদবি পাওয়া যাবে না, আবার ভালো ইংরেজি শেখার মতো মাথায় অতো ঘিলু নেই। তাই তারা এভাবে পদ্যাকারে শব্দ মুখস্থ করত–

ফিসফার বিজ্ঞলোক, প্লাউমার চাষা।
পাম্পকিন লাউকুমড়ো, কিউম্বার শসা॥

বিজ্ঞজনেরা ইংরেজ বিরোধী ছিল বিধায় এসব বিদ্যাহীন বাবুরা চাটুকারিতা করে বিভিন্ন পদে আসীন হতে থাকে। গুটি কয়েক ইংরেজি শব্দ শিখেই হয়ে যায় বিদ্যালয়ের ইংরেজিশিক্ষক। কাণ্ডজ্ঞানহীনভাবে বাংলা-ইংরেজি গুলিয়ে আবিষ্কার করে 'বাংরেজি'। এতে বাংলাভাষা যেমন চরমভাবে আহত হয়, তেমনি ইংরেজিভাষার সম্মানও অক্ষুণ্ন থাকে না। সেই জ্ঞানহীন লোকদের অনুসরণ করে আজকাল আভিজাত্যের দাবীদার জ্ঞানীরাও হয়ে পড়েছে চরম পর্যায়ের বাংরেজ ও ভাষাবিকৃতকারী!

১৯৪৭ সাল।

ভারত উপমহাদেশ স্বাধীন হলো। ইংরেজরা ভারত ছাড়ল। তবে যাওয়ার আগে ভারতকে দুভাগ করে দিয়ে গেল– ভারত ও পাকিস্তান। এখন আমরা পূর্ব পাকিস্তানের নাগরিক। রাষ্ট্রভাষা উর্দু, আঞ্চলিকভাষা বাংলা। এটা স্বাভাবিক বিষয়। যেমন পশ্চিমবঙ্গেরও রাজ্যভাষা বাংলা, রাষ্ট্রভাষা হিন্দি। এতে তেমন কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু সমস্যা সৃষ্টি হয় তখন, যখন বাঙালিদের উপর উর্দু চাপিয়ে দেওয়া হয় আর বাংলাভাষাকে উর্দু বর্ণে লিখতে বাধ্য করা হয়। তখন বাঙালীরা ফুঁসে ওঠে। ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলন শুরু হয়। ১৯৫৬ সালে পাকিস্তান সংবিধানে উর্দুর সাথে বাংলাকেও পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। তারপর মুক্তিবাহিনী প্রতিষ্ঠিত হলো। তারা ভারতের সহায়তায় পাকবাহিনীকে হারিয়ে ১৯৭১ সালে প্রতিষ্ঠা করল বাংলাদেশ নামে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। এই প্রথম বাংলা কোনো

রাষ্ট্রের প্রধান ও একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পেল। নজরুল-ফররুখের মতো কবিদের কলমের ধার আরও শাণিত হলো। কবিগুরু কাজি নজরুল ইসলাম যেমন নিজে অসংখ্য কবিতা রচনা করেছেন, তেমনি ফারসি কবি হাফিজ-রুমির অনুবাদও করেছেন। লক্ষ করলে দেখা যায়, কবিগুরু কবিতায় পাশ্চাত্যবাদ আমদানি করেননি। তাঁর কবিতায় ছিল না অহেতুক ইংরেজির মিশ্রণ।

কবি নজরুল বাংলায় হাফিজ-খৈয়ামের ফারসি কবিতার কাব্যানুবাদ করে পারস্যের প্রেমময় আবহকে বাংলা সাহিত্যে এনে একে পরিপূর্ণ করে দিতে চেয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন ইরানের গোলাব ও নার্গিসের সুবাস বাংলার যুঁই-চম্পা-চামেলীর বাগানে ছড়িয়ে বাংলাকে আরও সমৃদ্ধ করতে। বাংলার কোকিল সুরে তিনি শুনিয়েছেন ইরানি বুলবুলির গান। ওমর খৈয়ামের একটি 'রুবাই' (শ্লোক) ও তার অনুবাদ দেখে আসি–

در خواب بدم مرا خردمندے گفت :: کز خواب کسے را گل شادی نہ شگفت

کارے چہ کنی کہ با اجل باشد جفت :: برخیز کہ زیر خاک می باید خفت۔

ঘুমিয়ে কেন জীবন কাটাস? কইল ঋষি স্বপ্নে মোর–
আনন্দ-গুল প্রস্ফুটিত করতে পারে ঘুম কি তোর?
ঘুম মৃত্যুর জমজ ভ্রাতা, তার সাথে ভাব করিসনে
ঘুম দিতে ঢের পাবি সময় কবরে তোর জনম ভোর।

প্রতিথযশা উর্দু কবি আদিল আসির দেহলবিও উর্দুতে এই রুবাইর অনুবাদ করেছিলেন–

کل خواب میں مجھے کسی دانا نے کہا :: ہوتا نہیں بامراد سونے والا

ہے نیند بھی موت کے مشابہ اُٹھ جا :: اک روز تو زیرِ خاک ہے ہی سونا

বাংলা ও উর্দু দুটো অনুবাদকে পাশাপাশি রাখলে উর্দু অনুবাদ নজরুলের বাংলানুবাদের ধারের কাছেও ঘেঁষতে পারে না। তাছাড়া অন্তমিল ও মূল রুবাইয়ের মর্মানুবাদের দিকে তাকালেও বাংলাকে কয়েক ধাপ অগ্রগামী মনে হবে।

এভাবেই নজরুল-ফররুখ-আল মাহমুদদের হাত ধরে বাংলা এগিয়ে গেছে। হাতে হাত রেখে এযুগেও বাংলাকে সমুন্নত করে রেখেছেন আজাদ-মুহিবের মতো লেখক ও কবিগণ। মুহিব লিখেছেন–

এ যুগের আমি কাজী নজরুল, ইকবাল মহাকবি।
গালিব, হাফিজ, রূমী, খৈয়াম, সাদী, ফররুখ- সবি।
বহুকাল পরে তাহাদের ধ্বনি আমার কণ্ঠে বাজে।
তাহাদেরি খুন উথলিয়া ওঠে আমার ধমনি মাঝে।

পুনশ্চ: কুরআন কারিমে এসেছে– "আর আল্লাহ তাআলা আদমকে সমস্ত নাম শিক্ষা দিয়েছেন। তারপর তাকে ফেরেশতাদের সম্মুখে পেশ করেছেন।..." [সুরা বাকারা, ৩১]। এই আয়াত থেকে আমরা বুঝতে পারি, আল্লাহ তাআলা আদম আলাইহিস সালামকে দুনিয়াতে পাঠানোর পূর্বেই ভাষা শিক্ষা দিয়েছেন। অথচ আমরা পড়ে এসেছি, আফ্রিকায় সর্বপ্রথম ভাষার জন্ম হয়েছে। তার মানে, ইতিহাসবিদদের এই আলোচনা মনগড়া ও ভুয়া। তাহলে ভাষাবিস্তার কীভাবে হলো? কীভাবেই বা বাংলাভাষার উৎপত্তি হলো?– সে বিষয়ে আমরা অন্য কোনো সংখ্যায় আলোচনা করব, ইনশাআল্লাহ।

নজরুলের কাব্যানুবাদে মাওলানা রুমির মসনবি ও দেওয়ান হাফেজ–

بشنو از نی چون حکایت می کند :: از جدائی ہا شکایت می کند

(مثنوی: مقدمہ دفتر اول)

শোন দেখি মন বাঁশের বাঁশির বুক জেগে কী উঠবে সুর,
সুর তো নয় ও কাঁদবে যে রে বাঁশরি বিচ্ছেদ বিধুর।

شکر شکن شوند ہمہ طوطیانِ ہند

زین قند پارسی کہ بہ بنگالہ می رود

(دیوان حافظ: ۲۲۳)

আজকে পাঠাই বাংলায় যে ইরানের এই ইক্ষুশাখা
এতেই হবে ভারতের সব তোতার চঞ্চু মিষ্টি মাখা।

আকসার প্রকৃত হকদার কারা?

রাশেদুল ইসলাম

“অথচ পূর্ববর্তী নবীদের যামানায় যারা নবীগণকে অস্বীকার করেছে, নবীদের তিরোধানের পর তাদের কিতাবগুলো বিকৃত করে ফেলেছে, আজকের ইহুদি-খ্রিস্টানরা তাদেরই সন্তান!”

যুগে যুগে তাওহিদের কেন্দ্রবিন্দু ছিল আকসাঃ

শত শত আম্বিয়ায়ে কেরামের স্মৃতি বিজড়িত এই মাসজিদুল আকসা। দীর্ঘকাল যাবত এই মসজিদের মিহরাবে শত আম্বিয়ায়ে কেরাম নামাজ পড়িয়েছেন এবং মিম্বারে বসে তাওহিদের বাণী প্রচার করেছেন। এবং সেসব নবীগণের প্রায় সবাই আখিরে নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আগমনের সুসংবাদ দিয়ে গেছেন, তার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা দ্বীন ও শরীয়াতকে পূর্ণ করে দিবেন। এবং প্রত্যেক নবীই তাদের উম্মতকে আখেরি নবীকে পেলে পূর্ণ আনুগত্য করার আদেশ দিয়ে গেছেন। আর যেহেতু শেষ নবী আগমন করলে পূর্বেকার সকল শরীয়াত রহিত হয়ে যাবে। এবং তাঁকে মানলেই একমাত্র তাওহিদে বিশ্বাসী বলে গণ্য হবে, তাই স্বভাবত তাওহিদের এই কেন্দ্রবিন্দুও তারই অধীনে থাকবে।

মুসলমানদের প্রথম কেবলাঃ

মাসজিদে আকসা মুসলমানদের কাছে কতটা পবিত্র ও আকাঙ্খার হলে সেটিকে কেবলা বানিয়ে নামাজ পড়া যেতে পারে!

ইসলামের শুরুর জামানায় দীর্ঘ একটি সময় এই মসজিদের দিকে ফিরে আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তার সাহাবীগন নামাজ পড়েছেন এবং মে‘রাজের রাতে এখানেই তিনি আম্বিয়ায়ে কেরামের ইমামতি করেছেন। এখানেই রসূলুল্লাহ স. এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করা হয়েছে।

যারা আকসার ‘নবীদের মানবে’,তারাই আকসার হকদার হবে!

মসজিদে আকসা ও ফিলিস্তিন ছিল ইসলামের মহান মহান কয়েকজন নবীর আবাসভূমি। যারা এখান থেকে খাঁটি তাওহিদের বাণী প্রচার করে গেছেন। তাঁরা তাঁদের তাওহিদের প্রমাণ স্বরূপ একটি বিষয় গুরুত্ব দিয়ে উপস্থাপন করতেন, আর তা হলো– আখেরি নবীর আগমনের সুসংবাদ। কেননা তিনি এসে তাওহিদের চূড়ান্ত বিজয় কেতন উড়াবেন, তিনি পূর্ববর্তী নবীগণের তাওহিদের দাওয়াতকে সত্য

বলে স্বাক্ষ্য দিবেন। সুতরাং যারা পূর্ববর্তী নবীগণের সুসংবাদ অনুযায়ী আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি ঈমান এনেছে। কোন নবীকে অস্বীকার করেনি, কোন নবীর প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেয়নি, কোন নবীর ব্যাপারে কুফরি-শিরকি আকিদা পোষণ করেনি। তারাই কেবল একমাত্র মাসজিদুল আকসা ও ফিলিস্তিনের হকদার হবে। এই সমীক্ষা অনুযায়ী বর্তমান কেবল মুসলিম জাতিই আছে, যারা আখেরি নবীর প্রতিও ঈমান এনেছে, ঈমান এনেছে পূর্ববর্তী সকল নবীগণের উপরও। এবং তাদের সবার শিক্ষাকে নিরেট হিদায়াত মনে করে। নবী হিসেবে সবাইকে সমানতালে সর্বোচ্চ সম্মানের হকদার মনে করে।

বিপরীতে আকসার শত্রুরাই আজ আকসা পাসেবান ‘দাবি’ করে বসল!

মাসজিদুল আকসার প্রতিষ্ঠাতা ও সেখানে যুগে যুগে আগমন করা নবীগণের যারা ছিল ঘোর বিরোধী, বরং তখনকার অসংখ্য নবীগনকে হত্যাকারী চির অপরাধীরাই নিজেদের সম্রাজ্যবাদী হীন স্বার্থে আজ আকসাকে নিজেদের পূর্ব পুরুষদের মিরাস বলে দাবি করছে। অথচ পূর্ববর্তী নবীদের যামানায় যারা নবীগণকে অস্বীকার করেছে, নবীদের তিরোধানের পর তাদের কিতাবগুলো বিকৃত করে ফেলেছে, আজকের ইহুদি-খ্রিস্টানরা তাদেরই সন্তান। যেমন:

প্রমাণ–১

আকসার সাথে সর্বাগ্রে যে মহান নবীর নাম জড়িত, তিনি হলেন হযরত সুলাইমান আ.। যার নাম বিক্রি করে বর্তমান ইহুদিরা বাইতুল মাকদিস ভেঙে ‘হাইকলে সুলাইমানি’ বানানোর মিথ্যা ধার্মিকতা দেখাচ্ছে। সেই সুলাইমান আ. কেই তারা নবী মানে না। বরং তাঁকে একত্ববাদে বিশ্বাসীই মনে করে না। ইহুদিদের নিকট সুলাইমান আ. শেষ বয়সে মুরতাদ হয়ে যান। নাউযুবিল্লাহ। দেখুন তাদের বাইবেল– [১-বাদশাহ নামা (১১): ১-২১]

প্রমাণ-২

যে মাহান নবীর জন্মই বাইতুল মাকদিসের ভেতর। যার বেড়ে উঠা, উত্থান সবকিছুই বাইতুল মাকদিস কেন্দ্রিক, হযরত ঈসা আ.। এ কথা কার না জানা আছে যে, ইহুদিরা ঈসা আ. কে হত্যা করার সকল আয়োজন চূড়ান্ত করে ফেলেছিল। তবে আল্লাহ তাআলা নিজ কুদরতে তার এই রসূলকে আসমানে উঠিয়ে নিয়েছেন। (বরং আজকের ইহুদি-খ্রিস্টান উনাকে ওই ষড়যন্ত্রে হত্যা করা হয়েছে, এটাই বিশ্বাস করে।) তাহলে কোন পরিচয়ে নবীদের গড়া এই পবিত্র ভূমি নিজেদের পৈত্রিক বলে দাবি করতে পারে। এই দাবির একমাত্র হকদার তো মুসলমানরাই। যারা সে সকল নবীগণের একমাত্র অনুসারী।

এই তো গেল আদর্শিক যুক্তি। যদি রাজনৈতিক আলোচনা করা হয়, তাহলে তো তা মুসলমানদেরই ভূমি ছিল। এখনও আছে। এবং কতটা কূটকৌশল করে, কতটা অন্যায় উপাখ্যান গড়ে সম্রাজ্যবাদীরা তা দখল করেছে এবং করছে, তা তো চক্ষুষ্মান যে কেউ দেখছে!

তুফানুল আকসা: হামাস থেকে যা শিখল বিশ্ব

-আবু মুসায়্যিব

গত ১৭ অক্টোবর, ২০২৩। হামাস মুজাহিদ বাহিনি ভোরের আলো ফুটে না উঠতেই জারজ ইজরাইল অভিমুখে মুহুর্মুহু রকেট হামলা শুরু করে। একদল মুজাহিদ প্যারাগাইডিং করে সীমান্ত টপকে ভেতরে ঢুকে পড়ে। বিভিন্ন জায়গায় সীমান্ত দেওয়াল ধ্বসিয়ে দিতে শুরু করে। সেখান দিয়ে সশস্ত্র যোদ্ধারা গাড়ি ও মোটর সাইকেল দিয়ে ইজরাইলে প্রবেশ করে। এই সময় তারা ড্রোন থেকে বিস্ফোরক নিক্ষেপ করে দূর নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থাপনা ধ্বংস করে দেয়। এক দিনের কম সময়ের এই অভিযানে ৭০০ জন ইজরাইলি জারজ নিহত হয়। ২ হাজার ১৫৬ জন আহত ও ৭৫০ জন নিখোঁজ হয়। একশ জন পণবন্দি করা হয়। ইজরাইলের সেনাবাহিনী অধিকাংশ জায়গায় কোনো প্রতিরোধই গড়ে তুলতে পারেনি। মুজাহিদ বাহিনি হামাস এই অভিযানের নাম দিয়েছে: তুফানুল আকসা তথা ‘আকসা উদ্ধারের টর্নেডো।’ হ্যাঁ নামের একদম যথাযথ মিল রয়েছে। ইজরাইল কয়েক দশকেও এমন কিছুর মুখোমুখি হয়নি।

কল্পনাও করেনি হামাস এমন পারবে বলে। এরপর থেকেই ইজরাইল-হামাস যুদ্ধ শুরু হয়। আজ অবধি চলমান। ইজরাইল গণহত্যায় মেতে উঠেছে।

হামলার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কারণঃ

১. ইজরাইল হামাসসহ ফিলিস্তিনি মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করে ফেলার যে নীল নকশা করে রেখেছিল এবং গাজার চারপাশে দুর্ভেদ্য দেয়াল তৈরি করে যেভাবে গাজাকে পৃথিবীর সকল সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে রেখেছিল, তার জবাবে এই হামলা ছিল নিজেদের আত্মরক্ষামূলক হামলা। স্বাধীনতাকামী সংগ্রামের অংশ।

২. এই হামলার কারণে বিশ্বময়ে ফিলিস্তিন ইস্যু পুনরুজ্জীবিত হয়েছে। এটাও হামাসের একটি লক্ষ্য ছিল।

৩. আরব বিশ্বসহ পুরো বিশ্বের মুসলিম শাসকগণ ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে যেভাবে ইজরাইল ও আমেরিকাকে প্রভুর মতো সমীহ করা শুরু করেছে, তাদের একটু আত্মমর্যদাবোধ জাগানোর প্রয়াস ছিল এটি। (এই মেসেজ ছিল যে, হামাস এত শক্তিশালী ষাঁড়াশি হামলার প্রস্তুতি নিয়েছে এবং হামলা করেও ফেলেছে, অথচ তাদের কথিত 'মোসাদ' খবরও পেল না! সুতরাং কাদের তোমরা এত ভয় করছ?)

এই হামলা থেকে বিশ্ব যা শিখল :

সমগ্র বিশ্ব এই বিশ্বাস স্থাপন করে নিয়েছিল যে, ইজরাইল বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম সামরিক শক্তিধর রাষ্ট্র। এই হামলার ফলে তাদের ওই মিথ্যাচার ধুলোয় মিশে গেছে। হামাস-মুজাহিদ বাহিনীর বিমান বাহিনী, নৌবাহিনী এবং সুসংগঠিত সেনাবাহিনী না থাকা সত্ত্বেও তারা ইজরাইল বাহিনীকে নাকানি-চুবানি খাইয়েছে। এতে আরব বিশ্বসহ পুরো মুসলিম উম্মাহর জন্য এই শিক্ষা রয়েছে যে, কোনো প্রোপাগান্ডায় কান না দিয়ে নিজেদের ঈমান নিয়ে একটু জাগলেই হবে, ইনশাআল্লাহ।

এই হামলায় হামাস যা যা করে দেখিয়েছেঃ

ক. হাজারের অধিক ইজরাইলি সেনাকে জাহান্নামে পাঠিয়েছে। ৩শর অধিক সেনা ও পুলিশকে বন্দি করেছে। এদের মধ্যে উচুঁ পর্যায়ের কমান্ডারও ছিল।

খ. কুখ্যাত গোয়েন্দা সংস্থা 'মোসাদের' গোপন তথ্য এবং কম্পিউটারে সংরক্ষিত গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র হস্তগত করেছে।

গ. ইজরাইলের অত্যাধুনিক প্রযুক্তিকে অচল ও বেকার প্রমাণ করে ছেড়েছে। ৫০টির অধিক ট্যাংক ধ্বংস করেছে। এর মধ্যে এমন কিছু ট্যাংকও ছিল, যেগুলোকে দুনিয়ার সবচে শক্তিশালী ট্যাংক গণ্য করা হত। হামাস নিজস্ব প্রযুক্তি ব্যবহার করে এমন মিসাইল তৈরি করেছে, যা ট্যাংকগুলোকে ধ্বংস করে দিয়েছে।

ঘ. ইজরাইলের ৪ টি সামরিক ঘাঁটিতে আক্রমন করে সেখান থেকে হালকা ও মাঝারি অস্ত্র নিজেদের কব্জায় নিয়ে গেছে।

ঙ. ইজরাইলের কয়েকটি রাডার ধ্বংস করে ফেলেছে। আমেরিকার দেওয়া ক্ষেপনাস্ত্র বিধ্বংসী 'আয়রন ডোমের' অকার্যকারিতা প্রমাণিত করেছে।

চ. মধ্যপ্রাচ্যে যারা মোসাদের পক্ষ থেকে কাজ করত তাদের তালিকা তৈরি করেছে।

বিশ্ব রাজনীতিতে এই হামলার প্রভাব

১. আমেরিকা-বৃটেনরা মূলত ফিলিস্তিন দখল করে, ইজরাইল রাষ্ট্র কায়েম করে, মধ্যপ্রাচ্যে নিজেদের একটি ঘাঁটি তৈরির পরিকল্পনা করে আসছে। তাই তাদের মিডিয়ার মাধ্যমে হামাস ও ফিলিস্তিনের স্বাধিনতাকামী জনতাকে সন্ত্রাসী আখ্যা দেওয়ার হাজার হাজার চেষ্টা করে আসছিল। এর মাধ্যমে সেখানে নির্বিচারে গণহত্যা চালানোর নীল নকশা করেছিল। কিন্তু এই হামলার মাধ্যমে এই ষড়যন্ত্র নস্যাৎ হয়ে যায়। তারা এখন সেখানে গণহত্যা চালাচ্ছে ঠিকই, কিন্তু এই হামলায় তাদের আসল রূপ বেরিয়ে এসেছে। বিশ্ব এখন তাদের সন্ত্রাসী হিসেবেই অভিধা করছে। যথা:

ক. রাশিয়া ও চীনের মতো শক্তিধর রাষ্ট্রগুলো প্রকাশ্যে ফিলিস্তিনকে সমর্থন করেছে এবং ফিলিস্তিনের পদক্ষেপকে সঠিক আখ্যা দিয়েছে।

খ. এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ ও অধিকাংশ পশ্চিমা দেশ ইজরাইলকে জালেম ও অত্যাচারী সাব্যস্ত করেছে। ফিলিস্তিন ইস্যু সমাধানের উপর জোর দিয়েছে।

গ. 'জাতিসংঘ' 'নিরাপত্তা পরিষদ', ও 'ওআইসি'-গং নিজেদের পরিচয় টেকাতে হলেও ফিলিস্তিনের পক্ষে কয়েকটি মিটিং করেছে।

ঘ. মুসলিম উম্মাহর মাঝে 'আমীর', 'উমারা' লকবধারী মুনাফেকগুলোর চিরতরে চেহারা উন্মোচিত হয়েছে। একদিকে ফিলিস্তিনে নুন্যতম খাবারের অভাবে নারী, শিশু ও সাধারণ জনতা ধুঁকে ধুঁকে মরছে, অন্যদিকে এই মুনাফিক'গণ' নাচ-গানের আসরে মেতে উঠছে! মুসলমানরা শিখে নিয়েছে যে, তাদের দ্বারা উম্মাহর ক্ষতি বৈ কিছুই হবে না। ভবিষ্যতে এদের এড়িয়েই এগিয়ে যেতে হবে।

শাহাদাতের তৃষ্ণা তীব্রতর হয়ে উঠেছে

সর্বোপরি গাজার মুজাহিদ মাতা-পিতাগণ সবর ও কুরবানীর যে অনুপম দৃষ্টান্ত কায়েম করেছেন, এর দ্বারা মুসলিম উম্মাহ তাদের হারানো তৃষ্ণা ফের অনুভব করতে শুরু করেছে। কেউ এজন্যই মিষ্টি বিতরণ করছেন যে, তার পুরো পরিবার শহীদ হয়ে গেছে। তিনি এই গৌরবের অধিকারী বলে মিষ্টি বিতরণ করছেন!! সুবহানাল্লাহ! উম্মাহকে তার সোনালি অতীত চর্চা করে দেখিয়ে দিলেন তারা। এই উপমাগুলোই হতে পারে উম্মাহর জাগরণের প্রতিপাদ্য, ইনশাআল্লাহ।

দারুল ইলমের দিনরাত

গুরুত্বপূর্ণ কার্যবিবরণী...

ক্যাম্পাস পরিবর্তন

প্রথম ক্যাম্পাস (মার্চ ২০২৩-জানুয়ারি-২০২৪ঈসায়ি)

দারুল ইলমের প্রতিষ্ঠালগ্ন ক্যাম্পাস ছিল ঢাকা দক্ষিণখান বাজার থানাধিন গাওয়াইর-প্রেমবাগানে। ঢাকা বিমানবন্দর থেকে কসাইবাড়ি হয়ে বীর মুক্তিযুদ্ধা মুজাম্মেল হক রোডে দক্ষিণখান যাওয়ার পথে, স্কয়ার বিল্ডিং সংলগ্ন জনাব ইমরান সাহেব ও জনাব আশরাফ সাহেবদের মলিকানাধিন একটি দোকানের দ্বিতীয় তলার হলঘরে (২৫×১৫)। নিচতলায় ফেনী নিবাসী, বর্তমানে ঢাকার উত্তরখানে কাঁচকুড়ায় প্রতিষ্ঠিত জনাব জালাল আহমেদ সাহেবের পাখীর দোকান ছিল। মূলত জনাব জালাল আহমেদ সাহেবের সাথে দারুল ইলমের প্রতিষ্ঠাকালীন উপদেষ্টা, ডা. মুফতি মাহমুদ কাসিমির খুব সখ্যতা ছিল। তাই সেখানে ক্যাম্পাস নির্বাচন করা এবং জনাব জালাল সাহেবও যথেষ্ট পরিমাণ ধার্মিক ও মাদরাসার খায়েরখাহ ছিলেন। এই ক্যাম্পাসটি রাস্তার ধারে হওয়ায় মাদরাসার ভালোই প্রচার-প্রসার হয়। তবে জায়গার সংকুলান হচ্ছিল না। সাথে সাথে রাস্তার কোলাহল তালিমি পরিবেশের সাথে সাংঘর্ষিক মনে হচ্ছিল। তাই নতুন নিরিবিল কোনো ক্যাম্পাস অনুসন্ধান করার প্রয়োজন দেখা দিল।

মাদরাসার শৈশবের ১০ মাস

আমরা সেখানে ১০ মাস অবস্থান করি। এই ১০ মাস মাদরাসার নিতান্ত শৈশব ছিল। একদিকে টিকে থাকার প্রত্যাশায় সবর ও হিম্মতের লড়াই ছিল, অন্য দিকে অনেকের স্নেহ পাওয়াটা আমাদের পরম সৌভাগ্যের ছিল। বরং আল্লাহ তাআলার নুসরত বৈ কিছুই নয়।

ওই ক্যাম্পাসে খাওয়ার বিশুদ্ধ পানির কোনো ব্যাবস্থাই ছিল না। গ্যাস ছিল না। ঢাকা শহরে এই দুটি জিনিস ছাড়া একদিন অবস্থান করাও বড়ো দায়। শুন্য ফান্ডের অঙ্কুর এই মাদরাসাটির পক্ষে বোতলজাত পানি ও গ্যাস ব্যাবস্থা করার কল্পনাই করা যেত না। মাসিক ঘর ভাড়াটুকু আদায় করতে প্রচুর ঋণ করতে হচ্ছিল। এই মুহূর্তে মাদরাসার পাশে দাঁড়ান টাঙ্গাইল নিবাসী জনাব আজিজুল হক সাহেব। তিনি মাদরাসার পাশের বহুতল বিশিষ্ট্য নির্মাধীন প্রজেক্টের দায়িত্বশীল ছিলেন। প্রজেক্টে তাঁর আয়ত্বে খাকা নিজস্ব ডিবের পানি ও লাইনে সরবরাহকৃত গ্যাসের চুলা ও প্রজনীয় পাতিল মাদরাসার জন্য উন্মুক্ত করে দেন। শুধু তাই নয়, নিজের চুলায়, নিজের পাতিল দিয়ে রান্না করে তিনবেলা খাবার সময়মতো মাদরাসায় পৌঁছে দিতেন। সুবহানাল্লাহ। এই যেন খোদার সাক্ষাত নুসরাত। আল্লাহ তাআলা আমাদের তার শোকরগুজার বান্দা হিসেবে কবুল করুন।

১০ জনের পূণার্ঙ্গ কাফেলা

এই ক্যাম্পাস প্রথমে দুইজন তালিবুল ইলম ও একজন শিক্ষক দিয়ে শুরু হলেও দুয়েক মাসের ভিতর দুইজন উস্তাদ, ৭/৮ জন আবাসিক শিক্ষার্থী ও জনাব আজীজুল হক সাহেবসহ ১০ জনের একটি পরিবার গড়ে উঠে। এছাড়াও মাদরাসার সাথে সম্পৃক্ত ছিল উস্তাদ মহোদয়দের কাছে ঢাকার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিবিধ বিষয়ে পড়তে আসত আরো শ'খানেক শিক্ষার্থী। বিশেষত শুক্রবারে আয়োজিত বিভিন্ন কোর্সে পুরো উত্তরা থেকেই শিক্ষার্থীদের ঢল নামত।

প্রতিথযশা ওলামায়ে কেরাম ও মাশায়েখদের আগমন:

দারুল ইলমের পথচলা আশা জাগানিয়া ইনশাআল্লাহ। প্রচারহীন এই ভাঙাচোরা ক্যাম্পাসেও দেশ বিদেশের অনেক ওলামায়ে কেরাম তাশরিফ এনেছেন। প্রত্যেকেই দারুল ইলম সম্পর্কে নেক আশা ও বড়ো ধরণের তামান্না ব্যক্ত করেছেন, আলহামদুলিল্লাহ। এর মাঝে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন:

- **হযরত মাওলানা মাহফুজুল হক দা. বা.।**

মহাসচিব, বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ।
পীরে কামেল,

হযরত মাওলনা শেখ মুহাম্মদ সাহেব হাফি.

(মালোশিয়া প্রবাসী) ও বিশিষ্ট খলীফা, শাইখুল মাশায়িখ ফকীর যুলফিকার আহমদ নকশবন্দী হাফি.।

হযরত মাওলানা মুফতি মারুফ মুজিব সাহেব হাফি.

প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, জামিআতুল হাসানাইন ঢাকা বাংলাদেশ।

বিশিষ্ট্য আরবি ভাষাবিদ

হযরত মাওলানা মহিউদ্দিন ফারুকি হাফি.

প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, মারকাযুল লুগাতিল আরাবিয়্যা ঢাকা।

বিশিষ্ট দায়ী

হযরত মাওলানা যুবাইর হুসাইন সাহেব দা. বা.

প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, ইসলামিক দাওয়াহ ইনস্টিটিউট, মান্ডা, ঢাকা। -সহ প্রমূখ ওলামায়ে কেরাম ও হজ্ব ও ওমরাকারীদের অনেকে এখানে তাশরিফ এনেছেন, আলহামদুলিল্লাহ।

নতুন ক্যাম্পাসে

২০/৭/১৪৪৪ হিজরি
০১/২/২০২৪ ঈসায়ি

দীর্ঘদিন অনুসন্ধানের পর আখের দক্ষিণখান কাজিবাড়ি মোড়স্থ নূর ভিলার নিচ তলায় ভাড়ায় দুটি ফ্ল্যাট নেওয়া হয় মাদরাসার জন্য। তারিখটি ছিল ১লা ফেব্রুয়ারি-২০২৪। ওই সময় দারুল ইলমে তাশরিফ আনেন, দারুল উলূম দেওবন্দের সিনিয়র উস্তাদ, বিশিষ্ট্য দায়ী ও গবেষক, **হযরত মাওলানা মুযাম্মিল হক বাদায়ুনি হাফি.।** হযরতের হাতেই নতুন ক্যাম্পাসের উদ্বোধন হয়। এই উপলক্ষ্যে আরও যারা তাশরিফ আনেন:

শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা মুফতি নুরুল হুদা সাহেব । সাবেক শাইখুল হাদীস, ওয়াসিকপুর আজিজিয়া ও দারুস সুন্নাহ আমিশাপাড়া, নোয়াখালি। বর্তমান সিনিয়র মুহাদ্দিস, দারুল উলূম শর্শদি ফেনী-সহ স্থানীয় আহলে ইলমদের এক জামাত উপস্থিত ছিলেন।

প্রথম তালিমি বর্ষ পূর্ণ হলো, আলহামদুলিল্লাহ।

গত ৭ শাওয়াল, ১৪৪৪ হিজরি, দারুল ইলমের প্রথম শিক্ষাবর্ষ শুরু হয়। দুই জন শিক্ষার্থী প্রথম বর্ষে ভর্তি হয়। ডা. মুফতি মাহমুদ কাসিমি সাহেবের দেওয়া কয়েকটি চাটাই ছাড়া মাদরাসায় কিছু ছিল না। ছাত্ররা একটু লিখবে কোনো টেবিল ছিল না। আলহামদুলিল্লাহ, অল্প কিছু দিনের ভেতর টেবিলের ব্যবস্থা হয়, মুহিব্বীনদের মাধ্যমে আরও কিছু ছাত্রও এসে জড়ো হয়। লক্ষীপুরের মাপারি বাজারস্থ দারুল ইসলাম ইন্টারন্যাশনাল হিফজ মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, হযরত মাওলানা আনোয়ার হুসাইন সাহেব পাঠান প্রথম বর্ষের জিহাদ, ইবরাহীম, উমর, তাওহিদদেরকে। তাওহিদের মাধ্যমে আসে প্রথম বর্ষের মাহমুদ।

দারুল ইলমের আরেক জন অভিভাবক, জামিআ মাহমুদিয়া আল-আরাবিয়্যার প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, হযরত মাওলানা মুফতি হাবীবুল বাশার সাহেব তাঁর ভাতিজা ইয়াসিনকে পাঠান শরহে বেকায়া পড়ার জন্য। রংপুরের আখতার আসে মেশকাতের কিতাবগুলো পড়ার জন্য। ভারত থেকে আসে বর্ধমানের ইউসুফ শেখ আসেন দারসে নেযামির মৌলিক কিতাবগুলো রিভাইজড দেওয়ার জন্য।

প্রতি শুক্রবার আয়োজন হত একাধিক কোর্সের। যথা: ভূমি জরিপ কোর্স, বাংলাভাষা কোর্স, ইংরেজি পাঠশালা। প্রত্যেক কোর্সেই গড়ে ২৫/৩০ জন জ্ঞান পিপাসু উপস্থিত হতেন। অবশেষ গত ১১ শাবান, ১৪৪৫হি.-এর বার্ষিক পরীক্ষার মাধ্যমে দারুল ইলমের প্রথম তালিমি বর্ষ পূর্ণ হয়। শত শত অযোগ্যতা ও আসবাব হীনতার মাঝেও আল্লাহ গৌরবের সাথেই দারুল ইলমকে এগিয়ে যাওয়ার তাওফিক দিয়েছেন। ফালিল্লাহিল হামদ।

যেসব জামাতের দারস চলেছিল:

হুফফাজ প্রথম বর্ষ: (শিক্ষার্থী-৬ জন)
শরহে বেকায়া: (শিক্ষার্থী–১জন)
মেশকাত জামাত: (শিক্ষার্থী-১)
বিবিধ বিষয়ে দারস: (৬/৭-জন)
কোর্সে অংশগ্রহণ আনুমানিক ১০০জন।

২য় রমাদান, খতমে কুরআন ও নানান আয়োজনের কোর্স

গত রমজান ১৪৪৫হি ছিল দারুল ইলমের দ্বিতীয় রমজান। রমজানে যেহেতু মাদরাসা ছুটি থাকে, তাই দারুল ইলম প্রতিভা জাগানিয়া কতগুলো কোর্স ঘোষণা করে। এবং প্রতিটি কোর্সে অনলাইনেও অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেয় দারুল ইলমের বর্তমান সিনিয়র উস্তাদ, বহুল প্রতিভার অধিকারী হযরত মাওলানা ইফতিখারুল হক খাইর কর্তৃক অনলাইন মাদরাসা– 'মাদরাসাতুল খাইর বাংলাদেশ'। অনলাইন ও অফলাইন মিলে ব্যাপক সাড়া পড়ে, আলহামদুলিল্লাহ। দারুল ইলম ও মাদরাসাতুল খাইর-এর যৌথ পরিচালিত কোর্সগুলো হলো: বাংলাভাষা ও সাহিত্য কোর্স, ইংরেজি ভাষা কোর্স, বেসিক কম্পিউটার কোর্স, অফলাইন সারফ কোর্স, হস্তলিপি কোর্স ইত্যাদি।

এছাড়াও এই রমজানে এক জামাত হাফেজে কুরআন দারুল ইলমে সারফসহ বিভিন্ন কোর্সে অংশগ্রহণ করে বিধায় রাতের তারাবীহতে খতমে কুরআনের আয়োজন করা হয়। পনের দিনে খতম করা হয়। এটি দারুল ইলমের প্রথম খতমে তারাবীহ, আলহামদুলিল্লাহ। এর বরকত ও মাহাত্ম্য ছড়িয়ে ছড়ুক পুরো বিশ্বে। এর বরকতে দারুল ইলমের পথচলায় দৃঢ়তা ও ইখলাস পূর্ণ হোক, আমীন।

ইফতার মাহফিল

১২/৯/১৪৪৫ হিজরি
২৩/৩/২০২৪ ঈসায়ি

রমজানের কিছু দিন আগে দরুল ইমের ক্যাম্পাস পরিবর্তন হয়। তাই অনেক মুহিব্বীনকে নতুন ক্যাম্পাসের ঠিকানা চিনিয়ে দেওয়ারও প্রয়োজন ছিল। এছড়াও অনেকে দূর থেকে দারুল ইলমের খোঁজ-খবর নেন, দোয়া করেন, পরমর্শ দেন, তাদের এই পবিত্র ভালোবাসা নিইয়ে রাখার দারুল ইলম একটি ঈদি মজলিসের আয়োজনের উদ্যোগ নেয়। সাথে রমজানের হওয়াতে বরকতপূর্ণ ইফতারির দস্তরখানেরও আয়োজন করে দারুল ইলম। এতে উপস্থিত হন দারুল ইলমের সদরে মুহতামিম, পৃষ্ঠোপোষক হযরত মাওলানা মুফতি মারুফ মুজিব হাফি.। এছাড়াও আহ্বান করা প্রায় সকল মুহিব্বীন আগমন করেছেন। একটি স্মরণীয় মজলিস হয়েছিল।

দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ, ও হেদায়া জামাত

(২৪/০৪/২০২৪ প্রারম্ভ।)

গত ১৪ শাওয়াল, ১৪৪৫হি., মুতাবেক ২৮ এপ্রিল, ২০২৪ ঈ., দারুল ইলমের নতুন তালিমি বর্ষের সবকের ইফতিতাহ হয়। বুধবার আসরের পর, মাগরিবের আগ মুহূর্তের মুবারক সময়ে ইফতিতাহের মজলিস বসে। সবক প্রদান করেন, জামিআতুল হাসানাইন ঢাকা-এর প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, বিশিষ্ট হাদীস বিশারদ, হযরত মাওলানা মুফতি মারুফ মুজিব সাহেব হাফি.। এই বর্ষে হুফফাজ এডুকেশন সিস্টেম এর প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষ এবং হিদায়া জামাতে সবক শুরু হয়, আলহামদুলিল্লাহ।

সবক ইফতিতাহি মজলিসে আরও উপস্থিত ছিলেন: দারুল ইলমের উপদেষ্টা হযরত মাওলানা মুফতি মাহমুদ কাসিমি। হযরত মাওলানা মুফতি হাবীবুর বাশার কাসিমি, প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, জামিআ মাহমুদিয়্যা আল-আরাবিয়া ঢাকা, দারুল ইলমের আসাতেযায়ে কেরাম মুফতি হুসাইন আলহুদা, মুফতি সিদ্দিকুর রহমান, মুফতি ইফতিখারুল হক খাইর হাফি.।

হুজ্জাতুল ইসলাম ছাত্র কাফেলা

(০২/০৫/২০২৪)

তালিবুল ইলমদের দাওয়াতের ময়দানে দক্ষতার সাথে কাজ করার অনুশীলনের জন্য দারুল উলূম দেওবন্দসহ প্রতিটি মাদরাসায় ছাত্র কাফেলার প্রচলন রয়েছে। দারুল উলূম দেওবন্দে একে 'আঞ্জুমান' বলে। জেলা কিংবা প্রদেশভিত্তিক ছাত্রদের ভিন্ন ভিন্ন আঞ্জুমান থাকে। আমাদের আকাবিরদের মাঝে হযরত মাদানি, উসমানিদের যুগ থেকেই এর রেওয়াজ রয়েছে। এসব অঞ্জুমানের অধীনে ছাত্ররা বক্তৃতা, লেখালেখি, ভাষাচর্চা ও সমকালীন বিষয়াদি নিয়ে অনুশীলন করে। এর মাধ্যমে তার ইলমি দক্ষতার সাথে সাথে দাওয়াতের ক্ষেত্রেও দক্ষতা তৈরি হয়। তাই দারুল ইলমও 'আঞ্জুমান বা ছাত্র কাফেলার কার্যক্রম ঘোষণা করে। এই সংগঠন যেহেতু ছাত্ররা আসাতেযায়ে কেরামের তত্ত্বাবধানে পরিচালনা করে, এই বছর ছাত্রদের মধ্য থেকে দায়িত্ব প্রাপ্তরা হলো: নাজমুস সাআদাত (হিদায়া), ইয়াসিন আমীন (হিদায়া) ও উমর ফারুক জাদীদ (২য় বর্ষ)।

নবীন বরণ অনুষ্ঠিত: গত ২রা মে হুজ্জাতুল ইসলাম ছাত্র কাফেলার উদ্যোগে নবীন-বরণ শিরোনামে একটি প্রাণবন্ত ও স্বপ্নময় অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এতে নবীনরা তাদের স্বপ্নের কথা জানায়। আর প্রবীণরা দারুল ইলমের হালচাল জানায় যে, কীভাবে এখানে স্বপ্ন পূরণ করতে হয়।

বাইতুল্লাহ নিয়ে 'রোজনামচা'

আবেগ ও আবেশের বাইতুল্লাহ

বাইতুল্লাহ নিয়ে যখনিই যা কিছু পড়েছি, আমার বুক ভেঙ্গে আবেগের কান্না এসেছে। বাইতুল্লাহ! এমন একটি শব্দ, যা মুমিনের হৃদয়ে ইশকের আগুন ধরিয়ে দেয়। আরও যখন দেখি যে, আল্লাহর কোনো প্রিয় বান্দা শুভ্র আচ্ছাদনে বাইতুল্লাহ পানে দেওয়ানার মতো ছুটছে। হ্যাঁ একটু পরই সে লাব্বাইক লাব্বাইক বলে বাইতুল্লাহর চারিধারে অবস্থিত 'ইশক-দরিয়ায়' অবগাহন করবে। তখন তো জীবনের যে কোনো মূল্যে বইতুল্লাহ জিয়ারতের 'তামান্না' ব্যাকুল হয়ে উঠে।

কতজনই তো হৃদয়ে এই তামান্না পুষে রাখে জীবন ভরে, কারো জিয়ারত খুব সহজেই হয়ে যায়। আবার কারো তামান্না কবরেও চলে যায়! কারণ বাইতুল্লাহর জিয়ারত একেবারেই সহজ নয়, এর জন্য যেমনিভাবে বড়ো ধরণের মানসিক প্রস্তুতির প্রয়োজন রয়েছে, তেমনি রয়েছে অর্থনৈতিক প্রস্তুতিরও। তাই কল্পনা করলেই বাইতুল্লাহর জিয়ারত সম্ভব হয় না। আবার সামর্থ্য থাকলেও আল্লাহর মেহমান হওয়ার 'তাওফিক' না পেলে, তারও যে যাওয়া হয় না পবিত্র বাইতুল্লাহয়! সুতরাং এখানে সামর্থ্যের সাথে ইশক ও তাওয়াক্কুলের বিষয়ও রয়েছে। আবার বাহ্যিক সামর্থ্য না থাকলেও সৌভাগ্যক্রমে কেউ কেউ অতি উত্তমভাবেই বাইতুল্লাহর পুণ্যময়ী মেহমান হয়ে যান। তাই আল্লাহ তাআলার সামনে নিজের আবেগ ও মুহাব্বতের কথা প্রকাশ করতে হবে।

তিনি তো অন্তর্যামী, যা কিছু আমার জন্য কল্যাণ সেটারই ফয়সালা করবেন।

এক সময় বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ও ভারতের বোম্বাই বন্দর থেকে পানির জাহাজে করে, এতদাঞ্চলে হাজীদের বড়ো বড়ো কাফেলাগুলো সাগর পথে, বাইতুল্লাহ পানে রওয়ানা হত। আর তখন তাদের বিদায় দেওয়ার জন্য হাজার হাজার মানুষ বন্দরে উপস্থিত হত। যাদের এখনও যেয়ারতের সৌভাগ্য হয়নি, এবং কোনো ভাবে ব্যবস্থা হয়ে যায় কিনা, সে বুকে আশা বেঁধে চলছে, তারা অনেক দূর থেকেই আসতেন হাজীদের পবিত্র গমন দেখতে, কত যে আবেগঘন পরিবেশ বিরাজ করত তখন। আবেগে কান্নার রোল পড়ে যেত। সবাই চিৎকার করে কাঁদতেন!

এখন মানুষ 'পানির জাহাজে' হজ্বে যায় না। 'হাওয়ার জাহাজে' যায়। এবং অধিকাংশ বাইতুল্লাহর মুসাফির ঢাকার বিমানবন্দর হয়েই যায়। বিমানবন্দরের সন্নিকটেই হজ্বক্যাম্প। হাজীরা প্রথমে হজ্বক্যাম্পে এসে অবস্থান করেন। পরে বিমানের শিডিউল অনুযায়ী তাদেরকে স্পেশাল বাসে করে বিমানবন্দরে নিয়ে যাওয়া হয়। আমাদের মাদরাসা দারুল ইলম হজ্বক্যাম্পের সন্নিকটেই। হজ্বের মৌসুমে হজ্বক্যাম্প ও তার চার পাশ এক পবিত্র আভায় মৌ মৌ করে। দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা হাজীদের কাফেলা আসে। এখনও হজ্বের মৌসুম চলছে। পুরো হজ্বক্যাম্প এলাকা বাইতুল্লাহর মেহমান দ্বারা মুখরিত। দারুল ইলমের ছাত্র-শিক্ষকগণ এসব দেখে ঈর্শান্বিত হন। হয়তো ইশকের অনলে জ্বলে-পুড়ে ছাই হন। তাই 'সুরভি' এই পবিত্র আবেগগুলো সংরক্ষণের উদ্যোগ নিয়েছে। বাইতুল্লাহ নিয়ে নবীনদের আবেগগাথা নিয়ে এই আয়োজন।

যে দিন আমার সামর্থ্য হবে, ছুটে যাব বাইতুল্লাহ পানে!

-হাফেজ আহমদুল্লাহ, নোয়াখালি

পবিত্র মক্কা নগরি। আমাদের শেকড় যেখানে! সেখানে কী আছে?

-সেখানে 'আল্লাহর ঘর' আছে। সুবহানাল্লাহ!

আরো কি, সেটি যে আমার নবীজির জন্মভূমি ও ইসলামের আগমনস্থলও। কত মুবারক শহর এটি। সব মিলিয়ে মক্কায় যাওয়ার ব্যাকুলতা আমার হৃদয়ে নিজের অস্তিত্ব থেকেও বেশি অনুভূত।

পবিত্র মক্কা নগরির কথা কল্পনা করতেই আমাদের কল্পনায় ভেসে উঠে 'বাইতুল্লাহর' চার পাশের 'মাতাফখানি।' যেখানে হাজিরা লাব্বাইক লাব্বাইক জিকিরে প্রভুর উঠোনকে মুখরিত করে তুলেন। কল্পনায় আরও ভেসে উঠে জান্নাতের নিদর্শন 'হাজরে আসওয়াদ'। খলীলুল্লাহর স্মৃতিবিজড়িত 'মাকামে ইবরাহীম'। মহীয়সী হাজেরা আ.-এর ত্যাগের স্মারক 'সাফা-মারওয়া।' মহাশয় ইসমাঈল আ.-এর প্রজ্ঞাময়তার স্মারক 'মীনা ও জামারত'। জাবালে নূরের সেই পবিত্র চূড়া 'গারে হেরা'– যেখানে মানব জাতির পূর্ণাঙ্গ কল্যাণের বার্তা নিয়ে প্রথম ওহী অবতীর্ণ হয়। এবং কল্পনায় ভেসে উঠে সেই মাহন 'গারে সূর'– যেটি দ্বীনের জন্য হাবীবুল্লাহ স. ও সিদ্দীকে আকবরের অনুপম কুরবানীর একান্ত স্বাক্ষী হতে পেরেছে। আর উম্মাত পেয়েছে মুক্তির 'বিপ্লবী সংগ্রামের' এক প্রজ্ঞাপাঠ। এসবের কথা আমি শুধু কিতাবে পড়েছি। কুরআন কারীমে আল্লাহ তাআলা এই পবিত্র স্থানগুলোর কথা উল্লেখ করেছেন। কত সৌভাগ্যময় এই শহর। এই শহরের মাহাত্ম্য প্রতিনিয়ত আমাদের উস্তাদদের কাছেও শুনে থাকি। যার ফলে পবিত্র মক্কা নগরির জেয়ারতের তামান্না আমাকে জ্বলে ছারখার করছে। যেদিন আমার সামর্থ্য হবে, আমি সর্বাগ্রে বাইতুল্লাহর মুসাফির হব, ইনশাআল্লাহ। আমিও সবার জন্য দোয়া করি, এবং সবার দোয়া কামনা করছি, আল্লাহ তাআলা যেন আমাকে এবং আমাদের সবাইকে বাইতুল্লাহর মুসাফির হিসেবে কবুল করেন।

শিক্ষার্থী, দ্বিতীয় বর্ষ, কিসমুল হুফফাজ

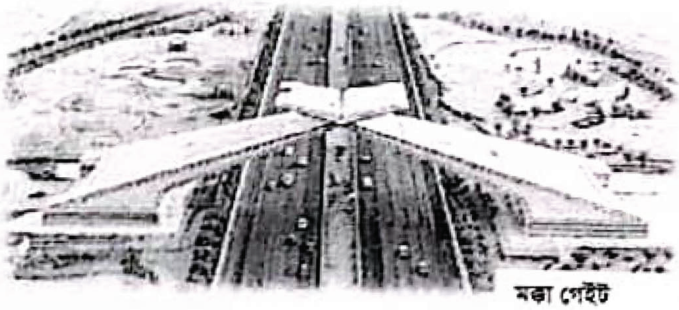

মক্কা গেইট

কাবা পরিচিতি

১. কা'বা ঘর

মাসজিদে হারামের ঠিক মাঝে কালো চাদরে আবৃত চার কোণ বিশিষ্ট্য ছোট্ট ঘরটি হলো 'কা'বা'। এর চার পাশের খালি জায়গাটা হলো মাসজিদে হারাম। পবিত্র কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তাআলা কা'বাকে একাধিক নামে অভিহিত করেছেন, যথা–

১. কা'বা (الْكَعْبَة) সূরা মায়েদা–৯৭:

﴿جَعَلَ اللهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ﴾

২. আল-বাইত (الْبَيْت) সূরা আলে ইমরান–৯৭:

﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾

৩. আল-বাইতুল আতীক (الْبَيْت الْعَتِيق) সূরা হজ্ব-২৯:

﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾

৪. আল-বাইতুল হারাম (الْبَيْت الْحَرَام) সূরা মায়েদা-২:

﴿وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ﴾

৫. আল-বাইতুল মা'মুর-(الْبَيْت الْمَعْمُور) সূরা তুর-১-৪:

﴿وَالطُّورِ (١) وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ (٢) فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ (٣) وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ (٤)﴾

৬. আল-বাইতুল মুহাররম-(الْبَيْتُ الْمُحَرَّمُ) সূরা ইবরাহীম-৩৭:

﴿رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ﴾

২. কাবার রুকনসমূহ

কাবার মোট রুকন চারটি:

১. রুকনে আসওয়াদ (কাবার দরজা ঘেঁষা ও যমযম কূপের মুখোমুখি,এতেই 'হাজারে আসওয়াদ' স্থাপিত, তাই এটিকে 'রুকনে আসওয়াদ'ও বলা। এখান থেকেই তাওয়াফ শুরু করা হয়।)

২. রুকনে শামী

৩. রুকনে ইয়ামানী

৪.রুকনে ইরাকী

বাকি অংশ–২৩ নং পৃষ্ঠায়

বাইতুল্লাহ নিয়ে রোজনামচা

ধনী-গরীব সবাই মক্কায় যেতে চায়

-মুহাম্মদ মে'রাজ, নোয়াখালি

আমি যখন থেকে শুনি, তখন থেকেই 'মক্কা মক্কা' এই পবিত্র শব্দটি শুনে আসছি। আমি যখন থেকে বুঝি, তখন থেকেই বুঝে আসছি যে, পবিত্র মক্কা আমাদের সবচে পবিত্রতম স্থান। যখন থেকে আমি স্বপ্ন দেখা শিখি, তখন থেকেই স্বপ্ন দেখে আসছি যে, আমিও এক দিন মক্কায় যাব, ইনশাআল্লাহ। আমাদের জীবনের সবচে প্রভাবিত ব্যক্তি হলেন রসূলুল্লাহ স.। নবীজির প্রতিটি কথা, প্রতিটি কদম ও প্রতিটি পদক্ষেপ আমাদের আন্দোলিত করে। তার মতো হওয়ার এবং তার পথে চলার প্রেরণা জোগায়। আমরা যখনই রসূলকে জানতে চাই, সর্বাগ্রে পবিত্র মক্কা নগরির আলোচনাই আসে। নবীজি স. এই শহরেই জন্ম গ্রহণ করেছেন, এখানেই বেড়ে উঠেছেন, এখান থেকেই ইসলামের দাওয়াত শুরু করেছেন। এই শহর কত যে মহিমান্বিত! তাই তো দেখি, সর্বস্তরের মুসলমানগণ যে কোনো মূল্যে মক্কায় যাওয়ার স্বপ্নসুখ লালন করেন। আমার প্রার্থনা হলো আল্লাহ তাআলা সবাইকে পবিত্র এই স্বপ্নটি পূরণের তাওফিক দিন, আমীন।

-শিক্ষার্থী, প্রথম বর্ষ। কিসমুল হুফফাজ। সোনাইমুড়ি, নোয়াখালি।

নবীজির স্মৃতি বিজড়িত সেই পবিত্র মক্কা নগরি

-হাফেজ নু'মান হুসাইন

আমাদের নবীজি আমাদের কাছে পৃথিবীর সবার চেয়ে প্রিয় ব্যক্তি। এমনকি মাতাপিতা থেকেও। নবীজির মাধ্যমেই আমরা পবিত্র মক্কা নগরির মাহাত্ম্য জানতে পারি। নবীজির মাধ্যমেই আমরা জানতে পারি যে, কা'বা শরীফ আল্লাহর ঘর। তো যে শহরে আল্লাহর ঘর আছে, সেই শহরটি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম শহর হবেই। শুধু তাই নয়, নবীজির জন্ম, বেড়ে উঠা, নবুওয়াত প্রাপ্তি, দাওয়াত ও বিশ্ব জয়ের সূচনা সব এই মক্কাতেই। তাই মক্কা নিয়ে আমাদের আবেগ যেন নিজেদের অস্তিত্বেরই বাস্তবতা। আর আমাদের জীবনে সর্বশ্রেষ্ঠ স্বপ্নটি হলো একবার 'বাইতুল্লাহর জিয়ারত।' বাইতুল্লাহ জেয়ারত শুধু শখের নয়, বরং শ্রেষ্ঠ একটি ইবাদতও।

শিক্ষার্থী, প্রথম বর্ষ, কিসমুল হুফফাজ। লক্ষীপুর।

একবার 'লাব্বাইক' বলতে চাই বাইতুল্লাহর ছায়ায় দাঁড়িয়ে

-হাফেজ জুবাইর হুসাইন রিফাত

আরব দেশ। আমার রসূলের দেশ। শুধু তাই নয়। স্বয়ং আল্লাহ তাআলার ঘর সেখানে। যাকে বলে বাইতুল্লাহ। আমরা যখন থেকে কথা বলতে শুরু করেছি, তখন থেকেই আমরা বাইতুল্লাহর গল্প শুনে আসছি এবং বইতুল্লাহর গল্প বলে আসছি। কারণ আমরা হাজার মাইল দূরের এই বাংলা থেকেও বাইতুল্লাহর দিকে ফিরে নামাজ পড়ি। আমাদের মাঝের ধনী-গরীব, ফকির-মিসকিন, সুস্থ-অসুস্থ সবাই বাইতুল্লাহয় যাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে আছে। প্রতি বছর আল্লাহর অনেক প্রিয় বান্দারা বাইতুল্লাহয় যান, লক্ষ লক্ষ মানুষ বাইতুল্লাহর মেহমান হন, সবাই এক সাথে হজ্ব পালন করেন। প্রথমে বাইতুল্লাহয় প্রবেশ করে 'লাব্বাইক লাব্বাইক' বলে নিজ রবকে হাজিরা দেন যে, হে প্রভু আমি আপনার উঠোনে এসে গেছি। সুবহানাল্লাহ, কত সৌভাগ্যবান তারা। আমারও হৃদয়টা ব্যাকুল হয়ে আছে বাইতুল্লাহর ছায়ায় দাঁড়িয়ে তৃপ্ত কণ্ঠে একবার 'লাব্বাইক' বলতে...।

শিক্ষার্থী, প্রথম বর্ষ, কিসমুল হুফফাজ। লক্ষীপুর

মক্কা, হে আমাদের কেবলা!

-হাফেজ জাহেদ আহমদ ফয়সাল

একজন মুসলিম যতই অপরাধ করেন না কেন, আখের কেবলামুখী হয়ে নিজেকে নিজের প্রভুর সামনে সঁপে দেন। এখানেই একজন মুমিনের পরিচয়। সে তার কেবলা অভিমুখী হয়ে দাঁড়ায়, আর তার কেবলা তাকে শেকড়ে ফিরে নিয়ে আসে। পবিত্র মক্কা আমাদের সেই মহিমান্বিত কেবলা। কেননা সেখানে স্বয়ং আল্লাহ তাআলার ঘর অবস্থিত। যাকে বলে বাইতুল্লাহ। আমরা বাইতুল্লাহর দিকে ফিরেই নামাজ পড়ি। তাইতো বাইতুল্লাহ আমাদের চির আবেগের। যার দিকে ফিরে নামাজ পড়ি, নিজেকে পরিশুদ্ধ করার চেষ্টা করি, সেটি নিজ চোখে একবার দেখার আবেগ কার ভেতরেই না উদ্রেক হবে। এবং যার আবেগ যত বেশি বিশুদ্ধ হবে, তা আল্লাহর কাছে তত বেশি মূল্যায়িত হবে। প্রতি বছর কত সৌভাগ্যবান আল্লাহর বান্দা বাইতুল্লাহর জিয়ারতে যান। সরাসরি বাইতুল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে লাব্বাইক বলে প্রভুকে ডাক দেন। আহ, কী যে অনাবিল মুহূর্ত। আমারও কত স্বপ্ন আর ইচ্ছে হৃদয় লুকায়িত আছে বাইতুল্লাহকে ঘিরে। হে আল্লাহ, আমাকেও কবুল করুন না আপনার এই প্রিয় বান্দাদের কাতারে।

-শিক্ষার্থী, প্রথম বর্ষ, কিসমুল হুফফাজ। ফেনী।

মক্কা শহর, দুনিয়ায় যেন জান্নাতি আবেশ

-জিহাদুল ইসলাম মারুফ।

মক্কা শহরে আল্লাহ তাআলার ঘর রয়েছে। যাকে আমরা কা'বা বলে বেশি চিনি। যার দিকে ফিরে মুমিনরা নামাজ পড়ে। একজন মুমিনের পরিচয়ই যেন পবিত্র কা'বা কেন্দ্রিক। মুমিনরা আল্লাহ তাআলাকে না দেখেই বিশ্বাস করে। এবং আরো বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে এই কা'বাকে নিজের ঘর বলে আখ্যা দিয়েছেন। এবং যারা মুমিন তাদেরকে এই ঘরের দিকে ফিরে নামাজ পড়তে বলেছেন। সুতরাং যারাই কা'বাকে নিজের কেবলা মানে তারাই মুমিন। তাইতো প্রতিটি মুমিনের জীবনের শ্রেষ্ঠতম একটি আকাঙ্ক্ষা হলো কা'বার জিয়ারত করা। আমি শুনেছি যে, কাবা চত্বরে প্রবেশের পর সবাই এক অনিন্দ্য আবেশে হারিয়ে যায়। কা'বা চত্বর থেকে বের হতে মোটেই মন চায় না। যতক্ষণ সেখানে থাকে ততক্ষণ নিজ প্রভুর ধ্যানে সবাই বিভুর থাকে। আবার বাইতুল্লাহর এলাকা সবার জন্য নিরাপদ। কোনো অপরাধী গেলেও তাকে সেখানে শাস্তি না দেওয়ার বিধান রয়েছে ইসলামে। যেন দুনিয়ায় এক টুকরো জান্নাত।

প্রথম বর্ষ, কিসমুল হুফফাজ, দারুল ইলম আল-ইসলামিয়া ঢাকা।

আব্বু-আম্মুকে নিয়ে হজ্বে যেতে চাই।

-রহিমুল্লাহ সিফাত

আমাদের পেয়ারা নবীজি স. এর আলোচনা এলেই আমরা জিজ্ঞেস করতাম, নবীজির বাড়ি কোথায়? বলা হত: মক্কায়। এতে মক্কা নিয়ে আমাদের হৃদয়ে যে ভালোবাসা ও আবেগ তৈরি হত, তা মেপে অনুমান করা যাবে না। প্রতি বছর আমাদের আশপাশ থেকে অনেকে পবিত্র মক্কায় হজ্বে যান। আর যিনি হজ্বে যান তিনি অনেক সম্মানিত হয়ে ফিরেআসেন। সবাই তাকে কত যে সম্মান করে। তিনিও নিজেকে পরিবর্তন করে নেন। এই কারণে আমাদের ছোটোদের মাঝে এই বাহাদুরি কাজ করত যে, বড়ো হলে আমিও মক্কায় যাব। আমারও ছোটো বেলার এমন কিছু স্মৃতি আছে। মনে পড়ে আমি আব্বুকে প্রায়শই বলতাম যে, বড়ো হলে আমি আব্বু-আম্মুকে নিয়ে হজ্বে যাব। আব্বু আমার কথা শুনে মাথায় হাত বুলিয়ে বলতেন যে, আল্লাহ, আপনি আমার ছেলের স্বপ্নটা পূরণ করে দিন।

আজ আমি শৈশব পেরিয়ে কৈশোর পার করছি। ঢাকায় পড়াশুনো করি। আমাদের মাদরাসার পাশেই হজ্বক্যাম্প। হজ্বের মৌসুমে হাজীদের কাফেলা এখান দিয়ে মক্কার উদ্দেশ্যে আকাশে উড়াল দেয়। এখন আমি আগের চেয়ে অনেক বেশি আবগ লালন করছি। হে আল্লাহ, আপনিই তো আমার শৈশবে এই লালনা দিয়েছিলেন। আপনিই তা পূরণ করতে পারেন। আমীন।

শিক্ষার্থী, প্রথম বর্ষ, কিসমুল হুফফাজ। চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা

বান্দা তার আল্লাহর ঘরে যেতে চায়

-হাফেজ আবু বকর সিদ্দীক

আল্লাহ তাআলাকে দেখার কার না মনে চায়। বরং একজন বান্দার জন্য এটিই তার পরম পাওয়া। কিন্তু তা যে সম্ভব নয়। কারণ আল্লাহ তাআলা বান্দাকে যে চোখ ও বোধ শক্তি দিয়েছেন, তা দিয়ে আল্লাহ তাআলাকে সরাসরি দেখা ও অনুধাবন করা সম্ভব নয়। তবে হাদীসে এসেছে, 'জান্নাতে তা সম্ভব হবে। আর জান্নাতিদের জন্য এটিই হবে সবচে বড়ো পুরস্কার। হ্যাঁ, দুনিয়াতে চাইলে আমরা আল্লাহ তাআলার নিদর্শনাবলি দেখতে পারব। যা দেখে আল্লাহ তাআলার অসীমতা অনুভব করতে পারব। বান্দার জন্য দুনিয়াতে আল্লাহ তাআলার সবচে বড়ো নিদর্শন হলো 'বাইতুল্লাহ।' কুরআনে কারীমে আল্লাহ তাআলা এটিকে বাইতুল্লাহ নামে অভিধা করেছেন, অর্থাৎ আল্লাহর ঘর। এবং আদেশ দিয়েছেন যে, আমরা যেন আমাদের প্রধান ইবাদত নামাজ বাইতুল্লাহর দিকে ফিরে আদায় করি। তাই বাইতুল্লাহয় যাওয়ার ব্যাকুলতা একজন মুসলিমের শৈশব থেকেই সত্তায় মিশে যায়।

-শিক্ষার্থী, দ্বিতীয় বর্ষ, কিসমুল হুফফাজ। রংপুর।

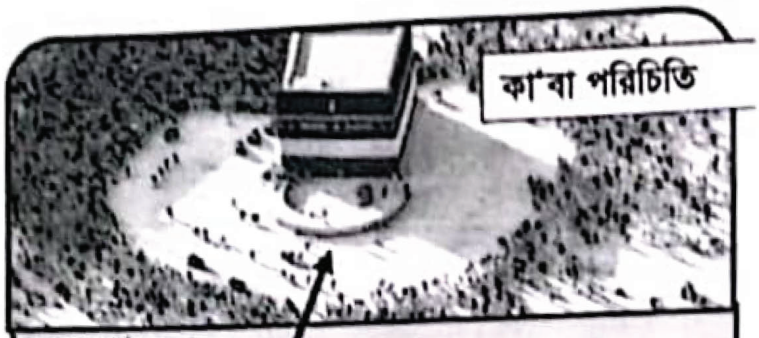

কা'বা পরিচিতি

(২১ নং পৃষ্ঠার পর)

৩. হাতীমে কা'বা:

কা'বা ঘরের উত্তর পাশে চন্দ্রাকৃতির বেষ্টনি দেওয়া একটি জায়গা। এটি মূলত কাবার অংশ। রসূলুল্লাহ স. এর নবুওয়াত লাভের কিছুকাল আগে কুরাইশরা কাবা ঘর সংস্কারের উদ্যোগ নেয়। কিন্তু হালাল ও পবিত্র সম্পদের অভাবে পুরো নকশার উপর ঘর নির্মাণ করা যায়নি। তাই কিছু জায়গা খালি রাখা হয়েছে। পরবর্তী তা মিলিয়ে নেওয়া হবে বলে সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু বিবিধ কারণে এই জায়গা আজও খালি রয়েছেড়। এটার নাম হাতীমে কা'বা। এটি কা'বা ঘরের অংশ।

৪. কাবা ঘর নির্মাণ ও সংস্করণ:

ইতিহাসের বর্ণনা মতে কাবা ঘর মোট ১২ বার সংস্করণ হয়েছে, যারা কাবা নির্মানের সৌভাগ্য পেয়েছেন, তারা হলেন:

১. ফেরেশতাদের মাধ্যমে প্রথম জমিনে স্থাপন করা হয়।
২. হযরত আদম আ.
৩.হযরত শীস আ.।
৪. হযরত ইব্রাহীম আ. ও ইসমাঈল আ.।
৫. আমালেকা গোত্র
৬. জুরহুম গোত্র
৭. কুসাই ইবনে কিলাব
৮. কুরাইশ গোত্র (২বার)
৯.আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাযি. (৬৫হি.)
১০.হাজ্জাজ বিন ইউসুফ
১১. সুলতান মুরাদ রাবে' (উসমানি খলিফা) ১০৪০ হি.

৫. হাজরে আসওয়াদ

কাবা ঘরের দরজা ঘেঁষা রুকনে আসওয়াদে স্থাপিত একটি পাথর। সেটি ডিম্বাকৃতির, কালো লালচে কালারের। হজ্ব ও ওমরায় এখান থেকে তাওয়াফ শুরু, এখান থেকে তাওয়াফ শেষ হয়। প্রতি একবার তাওয়াফ শেষে এটি অতিক্রম করার সময় হাতের ইশারায় চুমু খাওয়া হয়। হাজরে আসওয়াদ সম্পর্কে দুটি হাদীসে তার মাহাত্ম্য ফোটে উঠে:

(১) হাজরে আসওয়াদ জান্নাতি পাথর:

عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ الرُّكْنَ، وَالمَقَامَ يَاقُوتَتَانِ مِنْ يَاقُوتِ الجَنَّةِ، طَمَسَ اللهُ نُورَهُمَا، وَلَوْ لَمْ يَطْمِسْ نُورَهُمَا لَأَضَاءَتَا مَا بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ. (الترمذي: ٨٧٨، أحمد: ٧٠٠٠)

(২৩ পৃষ্ঠার পর থেকে)

অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেছেনঃ হাজরে আসওয়াদ এবং মাকামে ইব্রাহীম জান্নাতের

দুটি ইয়াকুত পাথর। আল্লাহ তাআলা সেগুলোর আলো নিভিয়ে দিয়েছেন, নতুবা সেগুলো পূর্ব-পশ্চিম পুরো পৃথিবী আলোকিত করে ফেলত। (তিরমিযি-৮৭৮, মুসনাদে আহমদ-৭০০০)

২. হাজরে আসওয়াদ সাদা-শুভ্র ছিল।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَزَلَ الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَهُوَ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ فَسَوَّدَتْهُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ. (الترمذي:٨٧٧)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেছেনঃ হাজরে আসওয়াদ জান্নাত থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। এটা দুধ থেকেও অধিক সাদা ছিল। মানুষের গুনাহ সেটিকে কালো করে ফেলেছে। (তিরমিযি-৮৭৭)

হযরত মুজাহিদ রহ. বলেনঃ যে বছর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাযি. কাবা ঘর ভেঙ্গে সংস্কার করছিলেন, ওই বছর আমি হাজরে আসওয়াদ দেখেছি যে, (তার উপরের প্রলেপ কালো হলেও) ভেতরের অংশ পুরোটা সাদাই ছিল।

৬. মুলতাযামঃ

হাজরে আসওয়াদ ও কাবার দরজার মাঝের আনুমানিক দুই মিটার পরিমাণ জায়গার নাম মুলতাযাম। এই স্থানে দোয়া কবুল হয়। এই স্থানে দুই হাতের বাহু, হাতের তালু, বুক ও দুই চোয়াল স্পর্শ করে দোয়া করা সুন্নত। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রাযি. থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি তাওয়াফ করলেন, (মাকামে ইব্রাহিমে) নামাজ আদায় করলেন। অতঃপর হাজরে আসওয়াদে চুমু খেলেন। এরপর হাজরে আসওয়াদ ও কাবার দরজার মাঝে দাঁড়ালেন। এবং (কাবার দেওয়ালে) বুক, দুই হাত ও চোয়াল স্পর্শ করালেন। এরপর ইরশাদ করলেন যে, আমি রসূলুল্লাহ স. কে এমন করতে দেখেছি। (ইবনে মাজাহ-২৯২৬) হাদীসটি হলো এইঃ

عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: طُفْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، فَلَمَّا فَرَغْنَا مِنَ السُّبْعِ، رَكَعْنَا فِي دُبُرِ الْكَعْبَةِ فَقُلْتُ: أَلَا نَتَعَوَّذُ بِاللهِ مِنَ النَّارِ، قَالَ: «أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ النَّارِ» قَالَ: ثُمَّ مَضَى، فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ، ثُمَّ قَامَ بَيْنَ الْحَجَرِ، وَالْبَابِ، فَأَلْصَقَ صَدْرَهُ، وَيَدَيْهِ، وَخَدَّهُ إِلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ» (ابن ماجه-٢٩٦٢)

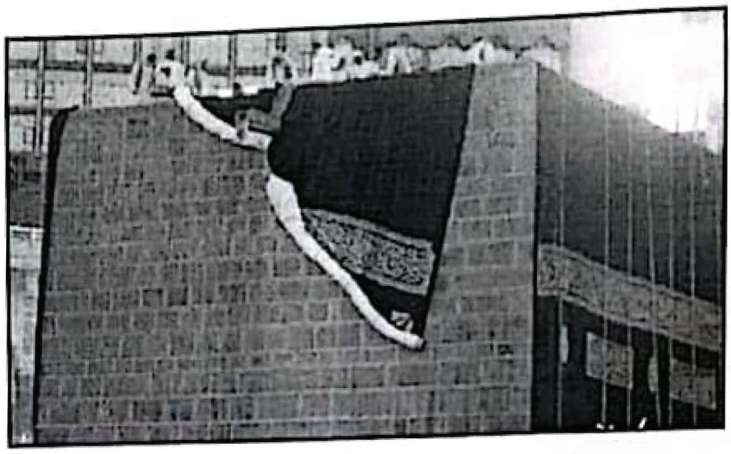

৭. কাবার গিলাফ

বর্তমান কাবার গিলাফ হয় রিশমি কাপড় দ্বারা, এবং তাতে সোনালি সুতোয় খচিত বিভিন্ন আয়াতের ক্যালিগ্রাফি করা হয়ে। প্রতি কুরবানির ঈদের দিন এটি পরিবর্তন করা হয়।

জাহিলি যুগ থেকেই কাবায় গিলাফ পরানো হত। সর্বপ্রথম কাবায় পূর্ণাঙ্গ গিলাফ পরিধান করান ইয়ামেনের হিমইয়ার রাজ্যের প্রসিদ্ধ সৎ বাদশাহ 'তুব্বা' (হিজরত পূর্ব-২২০) ।[তাফসীরে কুরতবি-২/৮৬]।

ঐতিহাসিক কোনো কোনো সূত্রে পাওয়া যায় যে, কাবার সর্বপ্রথম আংশিক গিলাফ পরান হযরত ইসমাঈল আ.। এরপর কুরাইশের সরদার কুসাই ইবনে কিলাবের যুগে তিনি কুরাইশ গোত্রগুলো নিয়ে এই নিয়ম করে নিয়েছেন যে, প্রত্যেক গোত্র হার অনুপাতে বার্ষিক চাঁদা প্রদান করবে। এবং তা দিয়ে প্রতি বছর গিলাফ পরিবর্তন করা হবে। এরপর কুরাইশের ধনাঢ্য ব্যক্তি আবু রবিআ ইবনে মুগিরা মাখযুমীর সময়ে এক বছর তিনি একাই গিলাফের ব্যবস্থা করতেন এবং এক বছর কুরাইশ ব্যবস্থা করত। তার মৃত্যু পর্যন্ত এইভাবে চলে আসে। তখন আশুরার দিন গিলাফ পরিবর্তন করা হত। কোনো এক বছর হযরত আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিবের মাতা নাবীলা বিনতে হুবাব নিজের মান্নতের নযরানা স্বরূপ একাই পুরো গিলাফের ব্যবস্থা করেন।

ইসলামি যুগে কাবার গিলাফ

মক্কা বিজয়ের পর রসূলুল্লাহ স. ইয়ামানি কাপড় দ্বারা গিলাফের ব্যবস্থা করেন। এই খরচ বাইতুল মাল থেকে বহন করা হয়। এরপর খুলাফায়ে রাশিদীনের যুগে হযরত আবু বকর ও ওমার রাযি. মিশরের প্রসিদ্ধ কুব্বাতি কাপড় (এক ধরণের সাদা পাতলা কাপড়) দ্বারা গিলাফ পরিধান করান। হযরত উসমান রাযি. বছরে দুই বার গিলাফ পরাতেন । একবার মিশরের কুব্বাতি কাপড় দ্বারা, আরেকবার ইয়ামানি কাপড় দ্বারা। হযরত মুআবিয়া রাযি. এর যুগেও বছরে দুই বার গিলাফ পরানো হত। একবার আশুরার দিন। দ্বিতীয় বার রমজানের শেষে, ঈদুল ফিতরের প্রস্তুতিমূলক। তিনিই সর্বপ্রথম ব্যক্তি যিনি কাবাকে পুরোপুরি খালি করেন। জাহিলি যুগের গিলাফগুলো খুলে ফেলেন। ইতিপূর্বে পূর্বের গিলাফ খোলা হত না। (আখবারে মক্কা-আবু ইসহাক ফাকিহী কৃত)

হাজরে আসওয়াদঃ ভেতর ও বাহিরের দৃশ্য মুলতাযামে দোয়ার দৃশ্য

স্বপ্নপুরীতে আমি

হাফেজ মু. তাওহিদ জামীল

আমার মনে অনেক সপ্ন। কিন্তু এই সপ্নগুলো কার কাছে গিয়ে বলব, যিনি আমাকে স্বপ্নের পসরা দেখাবেন, এমন কাউকে খুঁজে ফিরছিলাম। এক সময় আমি লক্ষ্মীপুর জেলার মান্দারি বাজারস্থ দারুল ইসলামে পড়েছিলাম। সেখানে আমাদের বড়ো হুজুর ছিলেন হাফেজ মাওলানা আনোয়ার হুসাইন সাহেব দা. বা.। গত বছর কোনো একদিন এক উপলক্ষ্যে হুজুরের সাথে স্বাক্ষাত করার জন্য গেলাম। স্বাক্ষাতের পর আমার স্বপ্নগুলো হুজুরের কাছে খুলে বলারও সুযোগ হলো। হৃদয় নিংড়ে হুজুরকে সব খুলে বললাম। হুজুর আমাকে জিজ্ঞেস করলেন: তুমি এখন কোথায় পড়ছ?

আমি বললাম, হাজীর হাট 'জামিয়া ইসলামিয়া মারকাজুল উলুম মাদরাসায়।'

হুজুর বললেন: এই মাদরাসা কি তোমাদের বাড়ির পাশে?

বললাম: জী হুজুর আমার বাড়ির পাশেই। তখন হুজুর আমাকে বললেন: তুমি যদি তোমার স্বপ্নগুলো পুরণ করতে চাও। তাহলে তোমাকে বাড়ির সান্নিধ্য ত্যাগ করতে হবে। তৎক্ষনাত আমি বললাম: জী হুজুর, ইনশাআল্লাহ আমি পারব।

হুজুর বললেন: ঠিক আছে ,তাহলে তুমি ঢাকায় চলে যাও। আমার জানা মতে একটি ভালো প্রতিষ্ঠান আছে। যদি তুমি সেখানে যাও, তাহলে তোমার স্বপ্নগুলো পুরণ করতে পারবে বলে আশা করি। তখন আমি বললাম: হুজুর, দয়া করে মাদরাসার ঠিকানাটা দিন। হুজুর আমাকে মাদরাসার ঠিকানা দিলেন। এবং মাদরাসার অফিসের নাম্বার দিলেন। আমি বাড়ি গিয়ে ওই নম্বরে যোগাযোগ করি। ঢাকার মাদরাসার হুজুরের সাথে কথা হয়।

হুজুর বললেন, তাহলে তুমি কবে মাদরাসায় আসবে?

আমি বললাম: হুজুর মাদরাসা কবে খোলা হবে?

হুজুর বললেন: আগামিকাল।

বললাম: আমিও আগামীকাল আসবো, ইনশাআল্লাহ ।

সকল প্রতীক্ষার পালা শেষ করে আমি ঢাকার দারুল ইলমে উপস্থিত হই। স্বপ্ন পূরণের আশায় বাড়ি থেকে বহু দূরের রাজধানীতে পাড়ি জমাই। এখানে আমার আজ প্রথম বর্ষ পূর্ণ হলো। এই এক বছরের পথচলায় নিজের স্বপ্নগুলোকে যেন খুব কাছ থেকেই অনুভব করছি, আলহামদুলিল্লাহ। এই মাদরাসার সিলেবাস, নিয়মকানুন, তারবিয়াত সবকিছুই স্বপ্ন জাগানিয়া। এই এক বছরের অর্জন নিয়েও যদি আমি পর্যলোচনা করি, তাহলে মনে হবে যে, আমি যদি এখান থেকে অন্য কোথাও চলেও যাই, তাহলেও একটি গন্তব্য পথে আমি চলতে পারব হয়তো, ইনশাআল্লাহ। কারণ এখানে আসার পর হুজুর আমাকে হাতে আঙুলে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, আমি কে, আমার পরিচয় কী, পৃথিবীতে আমাকে কি করে যেতে হবে। রসূলুল্লাহ স. কি মিশন নিয়ে এসেছেন, এবং সাহাবায়ে কেরাম সেটাকে কীভাবে চর্চা করে আমাদের জন্য নমুনা রেখে গেছেন!

হুজুর আমাদের সব সময় বলেন যে, সাহাবায়ে কেরাম যেভাবে নিজেদেরকে গড়ে তুলেছেন, যত ত্যাগ বিসর্জন দিয়েছেন, তোমাদেরও ঠিক সেভাবে ত্যাগের ও নিয়্যাতের নযরানা রাখতে হবে। আল্লাহ তাআলা আমাকে কবুল করুন। দারুল ইলমকেও কবুল করুন।

দ্বিতীয় বর্ষ, কিসমুল হুফফাজ, দারুল ইলম আল-ইসলামিয়া ঢাকা।

"হুজুর আমাদের সব সময় বলেন যে, সাহাবায়ে কেরাম যেভাবে নিজেদেরকে গড়ে তুলেছেন, যত ত্যাগ বিসর্জন দিয়েছেন, তোমাদেরও ঠিক সেভাবে ত্যাগের ও নিয়্যাতের নযরানা রাখতে হবে। আল্লাহ তাআলা আমাকে কবুল করুন। দারুল ইলমকেও কবুল করুন।"

দারুল ইলমের 'হুফফাজ এডুকেশন সিস্টেম'

ছুটে এলাম প্রতিভাশালায়

– হাফেজ ওমর ফারুক

তখন আমি বি-বাড়িয়াতে পড়ি। মার্কাজপাড়া দারুল কুরআন আল-ইসলামিয়া মাদ্রাসায়। সেখানের উস্তাদগণ আমাকে অনেক ভালোবাসতেন, স্নেহ করতেন। আলহামদুলিল্লাহ, উস্তাদদের নেক নজরেই ছিলাম। সেখানে হিফজ শেষ করে কিতাবখানায় নাহবেমীর পর্যন্ত পড়াশোনা করি। নাহবেমীর জামাতে বেফাকের কেন্দ্রীয় পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করি। পরীক্ষা শেষে বাড়িতে চলে আসি। পুরো রমজান বাড়িতেই থাকি। এ সময়ে আমি পাকিস্তানের জামিআতুর রশীদ সম্পর্কে অবগত হই। বিশেষত জামিআতুর রশীদের নতুন বিন্যাসিত সিলেবাস 'হুফফাজ এডুকেশন সিস্টেম' সম্পর্কে অবগত হই। তখন আমার খুব ঈর্ষা হয়–যদি পড়তে পারতাম! কিন্তু তা যে স্বপ্নেরই আখ্যান...।

রমজানের পর আবার আগের মাদরাসায় গিয়ে পড়াশুনা শুরু করে দিই। পুরো উদ্যমেই পড়ছিলাম। হঠাৎ আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি। বাড়িতে চলে আসি। চিকিৎসা নিতে থাকি। কিন্তু দুঃখজনকভাবে ওই বছর আর পড়া হলো না আমার। কারণ শারিরিক অবস্থা এতটাই প্রতিকূল ছিল যে, পড়ার জন্য মেহনত করব সে সাহস হচ্ছিল না।

এক পর্যায় আমি চিকিৎসার উদ্দেশ্যে ঢাকায় আসি। চিকিৎসার জন্য ধারস্থ হই হযরত মাওলানা মুফতি মাহমুদ কাসিমি হাফি.এর কাছে। তিনি একাধারে একজন চিন্তাশীল আলেমে দ্বীন। অন্যদিকে একজন অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ডাক্তারও। উনার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো তিনি একাধারে কয়েকটি প্যাথিতে সমানতালে দক্ষ মাশাআল্লাহ, যেমন–এলোপ্যাথিক, হোমিওপ্যাথিক, ইউনানী, আমালিয়্যাত প্রভৃতি। তাই তিনি যে কোনো রোগীর ব্যাপারে দ্রুতই সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারেন যে, তার জন্য কোন চিকিৎসাটা উপযোগী। তো আমি মুফতি মাহমুদ কাসিমির চিকিৎসায় আল্লাহর রহমতে সুস্থ হয়ে উঠি। কথা প্রসঙ্গে একদিন হুজুর আমার পড়াশোনার কথা জিজ্ঞেস করলেন। আমি আমার হালত জানানোর পর হুজুর আমাকে দারুল ইলম সম্পর্কে বলেন এবং সাথে করে নিয়েও যান। দারুল ইলমে এসে সেখানের সাথিদের সাথে কথা হয়। দেখলাম তারা হুফফাজ এডুকেশন সিস্টেমের কথা বলছেন। এবং জানালেন যে, দারুল ইলম জামিআতুর রশীদের আদলে বাংলাদেশের জন্য উপযোগী করে হুফফাজ এডুকেশন সিস্টেমের জন্য সিলেবাস প্রণয়ন করছে। এই যেন আমার জন্য স্বপ্নের বাস্তবতা। আমি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করি যে, আগামী বছর আমি এখানে এসে যাব।

আলহামদুলিল্লাহ, আমি এখন দারুল ইলমে অধ্যয়ন রত। দারুল ইলমের সিলেবাস সম্পর্কে একটু আলোকপাত করা সমুচিন মনে করছি। দারুল ইলমের প্রতিটি জামাতের সিলেবাস নিপুণভাবে বিন্যস্ত করা। তিনটি করে সেমিস্টার করা হয়েছে। প্রথম সেমিস্টারে প্রতি শাস্ত্রের প্রাথমিক ও সহজ একটি পাঠ্য বই রাখা হয়ছে। এরপর দ্বিতীয় সেমিস্টারে ক্রমান্বয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চতর পাঠ্যবই দেওয়া হয়। আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো প্রতিটি পাঠকে মননশীল করে উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হয়। গতানুগতিক পাঠদান নয়, মননশীল ও অনুশীলনমূলক পাঠদান-ভিত্তিক সিলেবাস প্রণয়ন করেছে দারুল ইলম। সাথে সাথে স্বপ্ন দেখিয়ে আগ্রহী করে তুলার বিষয়টিও দারুল ইলমে বেশ লক্ষ্যণীয়।

আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো প্রতিটি পাঠকে মননশীল করে উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হয়। গতানুগতিক পাঠদান নয়, মননশীল ও অনুশীলনমূলক পাঠদান-ভিত্তিক সিলেবাস প্রণয়ন করেছে দারুল ইলম। সাথে সাথে স্বপ্ন দেখিয়ে আগ্রহী করে তুলার বিষয়টিও দারুল ইলমে বেশ লক্ষ্যণীয়।

দারুল ইলম সুদূর লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে পথচলা শুরু করেছে। আখেরি জামানায় একদল আল্লাহ ওয়ালা রাহবার তৈরির মিশন হাতে নিয়েছে, যা প্রতিদিনই আমাদের মুদীর সাহেব দোয়ায় বলে থাকেন। আল্লাহ তাআলা যেন তার লক্ষ্য উদ্দেশ্যে কামিয়াবি দান করেন। আমীন।

নাস্তিক মানে কি জ্ঞানপাপী?

-শরীফুল ইসলাম আবরার

নাস্তিক মানে এমন একটি প্রজন্ম, যারা স্বার্থের দায়ে নিজেকে ধর্ম থেকে মুক্ত দাবি করে। আর ধর্ম থেকে মুক্ত মানে নৈতিকতা থেকে মুক্ত। কারণ পৃথিবীতে নৈতিকতার মৌলিক চর্চা ধার্মিকরাই করে। আর নৈতিকতা না থাকলে মানুষের কোনো মূল্যই থাকে না। না তার জ্ঞানের কোনো মূল্য থাকে, না তার সততার কোনো মূল্য থাকে। বস্তুত হচ্ছেটাও এমন। সমাজে রুচির এমন অবক্ষয় চলছে, যা সভ্য সমাজের জন্য মৃত্যু সমতুল্য। এসবের পুরোধা হলো নাস্তিকরা। এরপরও নাস্তিকরা টিকে আছে। এগিয়ে যাচ্ছে। কারণ তারা মানুষকে বোকা বানানোতে প্রাজ্ঞ। তারা শিক্ষার নামে ঠুনকো কিছু থিউরি উপস্থাপন করে, সরলমনা শিক্ষার্থীদের নিজেদের দলে ভিড়ে নেয়। তাদের দাবিগুলো কতটা ঠুনকো তার একটা উপমা দিচ্ছি।

"এক নাস্তিক স্যার ক্লাসে ছাত্রদেরকে বলছিল যে, আমরা যা দেখিনা, তা বিশ্বাস করব না। সরলমনা শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞানের থিওরি মনে করে মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানায়। এবার মাস্টার মশাই এনিয়ে বেনিয়ে, কথা প্যাঁচিয়ে চলে আসেন স্রষ্টার আলোচনায়। কথা গড়াল আল্লাহ তাআলা পর্যন্ত। আল্লাহ বলতে যেহেতু কোনো কিছু দেখা যায় না, তাই আল্লাহ বলতে কিছু নেই। এ কথা শুনতেই ক্লাসের এক শিক্ষার্থী দাঁড়িয়ে বলল, স্যার অনুমতি হলে একটু কথা ছিল। তিনি বললেন: হ্যাঁ বলতে পারো।

এবার শিক্ষার্থী ভূমিকা ছাড়াই বলল: স্যার আপনার মাথায় কোনো মেধাই নেই। আপনি মেধা শুন্য মস্তিস্কহীন এক আপাদ।

স্যার তো তেলে বেগুনে আগুণ। কি বললে? আমার মেধা না থাকলে আমি তোমার স্যার কীভাবে হলাম? জাতীয় পর্যায়ে পুরস্কার কীভাবে পেলাম? ইত্যাদি।

শিক্ষার্থী বলল: তা তো ক্ষণিক আগেই আপনিই দাবি করলেন। যা কিছু দেখা যায় না, বাস্তবে তার কোনো অস্তিত্ব নেই। এখন আপনার মেধা কোথায় সেটা আমি দেখতে চাই।

ধান্দাবাজ নাস্তিক দ্রুত প্রস্তান করল ক্লাস থেকে। সত্যিই এরা জ্ঞানপাপী-শয়তান হয়।

-শিক্ষার্থী, দ্বিতীয় বর্ষ, দারুল ইলম আল-ইসলামিয়া ঢাকা।

হতাশ হওয়া যাবে না!

-হাফেজ ওমর ফারুক

আমরা ইলম শিখতে এসেছি। আল্লাহ সম্পর্কে জানতে এসেছি। তাই আল্লাহর সৃষ্টিকুলের মাঝে আমরা সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি। শ্রেষ্ঠত্ব আমাদের পথের কারণে। আমরা ইলমের পথে আছি, এ জন্য। তাই সর্বদা আল্লাহর এই নেআমতের শোকরগোযার থাকা চাই। কোনো অবস্থাতেই হতাশ হওয়া যাবে না।

হতাশ হওয়ার একটি কারণ হতে পারে যে, পড়াশুনা কম পারা। এটি একটি মেধাগত বিষয়। আল্লাহ তাআলা কাউকে মেধা কম দিয়েছেন। কাউকে বেশি দিয়েছেন। তবে মেধাকে সফলতার চাবিকাঠি বানাননি। অনেক মেধাবি সফলতার দ্বারপ্রান্তেও যেতে পারে না। আবার অসংখ্য কম মেধার মানুষ আছেন যারা পৃথিবী জয় করে দেখিয়েছেন। এখানে মূল কথা হলো– মেধার বিকাশ হওয়া নিয়ে। মেধা বলা যায় সবার সমানই থাকে। তবে কারো মেধা দ্রুত বিকাশ হয়, কারো মেধা একটু ধীরস্থিরে বিকাশ হয়। তাই সবাইকে নমনীয় হয়ে মেহনত করতে হয়। মেহনত করতে করতে যে কারোর মেধা বিকাশ হতে বাধ্য। এটাই বাস্তবতা। তাই মেধা কম বলে, দ্বীনের পথ থেকে সরে যাওয়া আল্লাহর নেআমতকে উপেক্ষা করার নামান্তর। সুতরাং আমাদের উচিত সবর ধরে দৃঢ়পদ থাকা। ইনশাআল্লাহ কামিয়াবি আসবেই।

মেহনতের মাধ্যমে মেধা বিকাশের একটি ঘটনা বলি:

জগদ্বিখ্যাত দার্শনিক 'শেখ সাদি রহ.'। তিনি নিজের ঘটনা নিজেই বর্ণনা করছেন যে, মেধা হীনতার কারণে হতাশ হয়ে চেয়ে ছিলেন কোথাও হারিয়ে যাবেন। কোনোভাবেই পড়াশুনা আয়ত্ব করতে পারছিলেন না। তাই একদিন এই নিয়্যাতে বেরিয়ে পড়লেন অজানা উদ্দেশ্যে। কিছু দূর যাওয়ার পর দেখতে পেলেন যে, পাহাড়ের ঝর্না থেকে ঘেমে পানি একটি পাথরের উপর পড়ছে, আর দীর্ঘ দিন পানি পড়ার কারণে ওই পাথরে গর্ত জন্ম নিয়েছে। এখান থেকে তিনি এই শিক্ষা নিলেন যে, যদি ফোঁটা ফোঁটা পানি অনবরত মেহনতের কারণে পাথর ছিরে ফেলতে পারে, তাহলে আমার হৃদয় কি পাথর থেকেও শক্ত নাকি! তিনি ফিরে এলেন, পুরো উদ্যমে পড়াশুনা শুরু করলেন। এক পর্যায়ে তিনি জগদ্বিখ্যাত দার্শনিকে পরিণত হলেন। আজ হাজার বছর পরও তার দর্শনগুলো জীবন্ত। পৃথিবীব্যাপী পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভূক্ত।

তাই প্রিয় সাথি, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ইলম শিখার জন্য নির্বাচন করেছেন। এই নেয়ামতের যেন কোনো প্রকারের খেয়ানত না হয়। কোনো ঠুনকো অভিযোগ যেন আমাদের সম্ভাবনাময় জীবনকে নষ্ট না করে দিতে পারে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সবরের সাথে ইলম অর্জনের তাওফিক দান করুন। আমীন।

-শিক্ষার্থী, দ্বিতীয় বর্ষ, দারুল ইলম আল-ইসলামিয়া ঢাকা।

আসুন পরিপাটি হই

-হাফেজ জিহাদুল ইসলাম

বড়োদের মুখে একটি কথা শুনেছি যে,"তোমার উপস্থিতিতে তোমার চারপাশ দ্বারা তোমাকে চেনা যাবে, আর অনুপস্থিতিতে তোমার শুন্য জায়গা দ্বারা তোমাকে চেনা যাবে।"

তোমার চারপাশ তোমার রুচির পরিচয়

অর্থাৎ আমারা যেখানে বাস করি বা যেখানে থাকি, তার চারপাশ যতটা গোছালো হবে এবং পরিপাটি হবে, মানুষ আমাদের রুচি সম্পর্কে ততটা স্বচ্ছ ধারণা পোষণ করবে। বিপরীতে যদি আমার চারপাশ আগোছালো হয়, তাহলে মানুষ তা দেখেই আমার রুচিতে তকমা লাগিয়ে দেবে, এটাই স্বাভাবিক। তাই নিজের ব্যক্তিত্বের দায়ে চারপাশ গুছিয়ে রাখতে হবে। এছাড়াও যারা সত্ত্বাগত রুচিশীল মানুষ, তারা এমনিতেই নিজের পরিবেশ গুছিয়ে রাখেন। আগোছালো পরিবেশে তাদের শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসে।

তোমার শুন্যস্থান তোমায় পদর্শন করে

আমরা যখন নিজের জায়গায় থাকি না, বাইরে কোথাও যাই, তখন আমি আমার চারপাশ যেভাবে রেখে যাব, আগত মানুষ আমাকে তেমনি ধারণা করবে। যদি তারা আমার আসবাব ও আশপাশ গোছালো দেখে, তাহলে আমাকে গোছালো রুচির মানুষই ধারণা করবে। বিপরীতে যদি এসব আমি গুছিয়ে না যাই, তাহলে আমি যতই উন্নত রুচি লালন করি না কেনো, মানুষ আমাকে বাসস্থান দেখেই বিচার করবে।

এক কথায়, আমার চারপাশ হলো আমার পরিচয়। তাই নিজের চারপাশের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি থাকার বিশেষ রুটিন তৈরি করতে হবে। এছাড়াও একজন মুমিনের জন্য পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি থাকা তার ঈমানের দাবি। রসূলুল্লাহ স. তাই ইরশাদ করেছেন:

إن مِنْ شُعَبِ الإيمان إِمَاطةُ الأَذى عن الطريق.

ঈমানের একটি শাখা হলো পথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করা। (মুসলিম–৫৮, তিরমিযি–২৬১৪)

অর্থাৎ মুমিন নিজে তো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকবেই। অন্যের চলার পথে কোনো আবর্জনা দেখলেও সে তা পরিষ্কার করার চেষ্টা করবে। এই হাদীস থেকে নেওয়া আরবির একটি প্রবাদ বাক্য হলো:

النَظَافَةُ مِنَ الإِيمَان.

পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ।

অর্থাৎ একজন মুমিন যেহেতু দুনিয়াতে মর্যদার দিক থেকে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, তাই বাহ্যিকভাবেও তাকে অভিজাত হতে হবে। যাতে অন্যরা তাকে নিরঙ্কুশ অনুসরণ করতে পারে। বিশেষত মাদরাসার পরিবেশে আমাদের অনেক বেশি পরিপাটি থাকা চাই। কারণ বিশ্বব্যাপী দ্বিনের যৎসামান্য যা চর্চা হচ্ছে, তা মাদরাসাতেই বিশদ্ধভাবে হচ্ছে। তাই মাদরাসার পরিবেশ যত পরিচ্ছন্ন ও অভিজাত হবে, মানুষ দ্বীনের ব্যাপারে তেমন ধারণা পোষণ করবে। তো দ্বীনের মান-ইজ্জত রক্ষা করতেই আমাদের পরিপাটি থাকতে হবে।

নিচে মাদরাসার পরিবেশ পরিপাটি রাখার কিছু টিপস তুলে ধরছি:

এক. সামান যেখান থেকে নিয়েছি সেখানেই রাখি:

মাদরাসায় প্রতিটি সামান রাখার নির্দিষ্ট জায়গা থাকে। যথা: প্লেট এক জায়াগায় থাকে। গ্লাস এক জায়গায় থাকে। তো আমরা যখন কোনো সামান ব্যবহারের জন্য নিব, ব্যবহার শেষে সেখানেই রেখে আসব। এক্ষেত্রে আমরা করি কি, সামান ব্যবহর শেষে যে কোনো জায়গায় হাত থেকে তা রেখে দেই। যার ফলে প্লেট-গ্লাসগুলো যত্রতত্র বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে থাকে। এতে পরিবেশ নষ্ট হয়, সামানগুলোও দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়। দেখতেও দৃষ্টিকটু লাগে।

দুই: কাপড় কোথায় পড়ে আছে, একটু খবর রাখি:

আমরা গোসল করে কাপড় শুকাতে দিই। সেটা শুকিয়ে যাওয়ার পর ভাঁজ করে ব্যাগে রেখে দিই। এতে কাপড়ে জীবানুও মিশবে না। পরিবেশটা পরিপাটি হয়ে উঠবে। কিন্তু আমাদের হয় কি, কাপড় শুকিয়ে যাওয়ার পর তা ধুমড়ে-মুচড়ে যথেচ্ছা পড়ে থাকে। কখনও মাটিতে বা ফ্লোরে পড়ে থাকে, ময়লায় গড়াগড়ি করে। এতে বিষাক্ত জীবানু সংক্রমন হয় তাতে, এবং পরিবেশও নষ্ট হয়। নিজেকে সুস্থ ও পরিপাটি রাখার স্বার্থে দয়া করে যথা সময়ে নিজের কাপড় সংরক্ষণ করি।

অপেক্ষাকৃত ছোটো জিনিসের বেশি যত্ন নিন:

চামচ, ছুরি, দিয়াশলাই, লবনের বাটি, লুচ কাপড় ইত্যাতি বস্তুগুলোর প্রতি আমরা প্রতি মুহূর্তে মুহূর্তে মুখাপেক্ষী হয়। এগুলো ব্যবহার করার পর অবশ্যই নির্দিষ্টস্থানে রাখব। নতুবা একটু পরই আবার খুঁজে পাব না। এতে যেমন আমাদের কাজের ব্যাঘাত ঘটবে, তেমনি সময় মতো খুঁজে না পাওয়ার কারণে মস্তিস্কেও আঘাত লাগে।

রোজনামচা কি:

মাওলানা আবু তাহির মিছবাহ হাফিযাহুল্লাহ লেখেন :

"যদি তুমি লেখা শিখতে চাও এবং ভবিষ্যতে একজন বড়ো লেখক হতে চাও, যদি তুমি সাহিত্য অর্জন করতে চাও এবং আগামী দিনের 'সাহিত্যরত্ন' হতে চাও তাহলে নিয়মিত রোজনামচা লেখাই হলো এর সহজতম উপায়। রোজনামচা মানে ডায়েরি। তো রোজনামচা বা ডায়েরি লেখার অর্থ কী ? এক কথায় এর অর্থ হলো, তোমার জীবনে এবং তোমার চারপাশের পরিবেশে প্রতিদিন যা কিছু ঘটে, তুমি প্রতিদিন যা কিছু করো, যা কিছু দেখো, যা কিছু শোনো এবং যা চিন্তা করো, সেগুলোর কিছু কিছু সেই দিনের সন-তারিখসহ খাতার পাতায় (বা বাজার থেকে সংগ্রহ করা ডায়েরির পাতায়) লিখে রাখা। ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ঘটনা, সামাজিক ও জাতীয় ঘটনা, এমনকি আন্তর্জাতিক ঘটনাবলিও নিজের চিন্তা-ভাবনার ও অনুভব-অনুভূতিরর আলোকে লেখা যেতে পারে...।"

[এসো কলম মেরামত করি-৩০৫]

ভাষার আসর ও রোজনামচা

ভাষার আসর। দারুল ইলমের একটি উন্মুক্ত আয়োজন, প্রতি শুক্রবার সকাল আটটা থেকে শুরু হয়ে দুই-আড়াই ঘণ্টার আয়োজন। এখানে যারা আসতে চান, তাদের একটি করে রোজনামচা নিয়ে আসতে হয়। কেননা বিজ্ঞজনরা বলেছেন যে, যারা লেখক হতে চায়, লেখায় পারদর্শী হতে চায় তাদের জন্য রোজনামচা লেখাই হলো এর সহজতম উপায়। আর নবীন লিখিয়েদের রোজনামচাগুলোর পরিচর্যার লক্ষ্যেই ***সুরভির*** পথচলা। আর সুরভির এই বিভাগটি সম্পূর্ণ নবীনদের জন্য। এটি তাদের মালিকানা সম্পত্তি। তারা লেখা পাঠাবে। আর সুরভি তাতে সৌরভ মিশিয়ে লেখাটাকে উপযুক্ত করে ছাপিয়ে দিবে। সুতরাং সুরভির এই বিভাগে যে কেউ লেখতে পারেন। লেখা যেমনই হোক, সুরভি সেটাকে পরিচর্যা করে উপযুক্ত করে তোলার চেষ্টা করবে।

২৭/১১/১৪৪৪ ঈসায়ি

শুভ্র কাফেলা কোথায় যায়!

প্রতি শুক্রবার, আমরা কয়েকজন বসুন্ধরা থেকে বিমানবন্দর হজ্বক্যাম্প হয়ে দারুল ইলমে যাই। দারুল ইলমে বাংলাভাষা শিক্ষার আসর হয়। গত শুক্রবার হজ্বক্যাম্পের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দেখলাম কতগুলো বাস হুজ্জাজে কেরামদের জন্য অপেক্ষা করছে। আবার রাতে নিজ ক্যাম্পাস 'বসুন্ধারা ইসলামিক রিচার্জ সেন্টারের' বারান্দায় দাঁড়িয়ে যখন এই কাফেলা নিয়ে ভাবছিলাম, তখন মাথার উপর দিয়ে একের পর এক বিমান উড়াল দিচ্ছিল। এই মৌসুমে এত ঘন ঘন বিমান উড়াল দেওয়ার অর্থ হয়তো এই হতে পারে যে, এগুলো হাজি সাহেবানদের বিশেষ ফ্লাইট। সব মিলিয়ে আজ কয়েকদিন ধরে বাইতুল্লাহর প্রতি অতিশয় আবেগ ও হৃদয়ের টান অনুভব করছি। যে কোনো মূল্যে এই কাফেলায় যুক্ত হয়ে বাইতুল্লাহ পানে হারিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে। হৃদয়ের ক্যানভাসে ভেসে উঠছে সাড়ে চৌদ্দশত বছর পূর্বের সরদারে কায়েনাত স. ও হিদায়তে সিতারা সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর সোনালি দৃশ্যগুলো। কত না অনুপম ছিল সেই মুহূর্তটি, যখন রসূলুল্লাহ স. খোদ কাফেলা নিয়ে পবিত্র মক্কায় প্রবেশ করছেন। সাহাবায়ে কেরাম স্বচক্ষে রসূলুল্লাহ স. এর দিকে তাকিয়ে আছেন। রসূল যা করছেন, তারাও তা করছেন। আহ্, আজ যদি কেউ রসূলের রওজায় আমার সালামটা হলেও পৌঁছে দিত! আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম ওয়া-বারিক আলা নাবিয়্যিনা মুহাম্মদ।

-মাওলানা আব্দুল কারীম
ইফতা বিভাগ, বসুন্ধরা ইসলামিক রিচার্য সেন্টার।

ফিরতি মেইল: আপনার সাথে আমাদের সালামখানিও পৌঁছে দিন হাবীবুল্লাহ স. এর পবিত্র রওজায়। আসসালাতু আসসালামু আলা নাবিয়্যিনা মুহাম্মদ।

১৬/৬/২৩ ঈসায়ি

মুসলিমদের জন্য আরবি বর্ষপুঞ্জি

হযরত ওমর রাযি.-এর খেলাফতকালে খেলাফতের সীমানা যেহেতু অনেক বিস্তৃত হয়ে গিয়েছিল। এবং খলিফা হযরত ওমর রাযি. যেহেতু বিভিন্ন গভর্নরদের কাছে বিভিন্ন নির্দেশনা দিয়ে ফরমান পাঠাতেন, তখন তিনি শুধু আরবের রেওয়াজ অনুযায়ী তারিখ ও মাসের নাম লিখতেন। অনেক সময় এই ফরমানগুলো পৌঁছতে অনেক সময় লেগে যেত। তাই এ ফরমানটা ঠিক কখনের তা নিয়ে সবাইকে পেরেশানির সম্মুখীন হতে হত। তাই হযরত উমার রাযি. সাহাবায়ে কেরামের সাথে পরামর্শ করে হিজরি সনের পবর্তন করেন। হিজরি সন আরবি মাস দিয়ে বিন্যাসিত। ইসলামের মৌলিক অনেক বিধান আরবি মাসের সাথে সম্পৃক্ত। তাই আরবি সনের প্রয়োজনীয় খুবই প্রকট ছিল। এর শুরু কখন থেকে হবে তা নিয়ে যখন বিবেচনা করা হয়, তখন আখের এই সিদ্ধান্ত হয় যে, যেহেতু রসূলুল্লাহ স. জন্ম তারিখ নিয়ে মতানৈক্য আছে, তাই তখন থেকে হচ্ছে না। আর তার মৃত্যু তারিখ থেকে শুরু করলে তাতে শোকের মিশ্রণ থেকে যায়। মাঝে হিজরত থেকে শুরু করা যায়, কারণ হিজরত ইসলামের অনেক বড়ো একটি প্রেক্ষাপট। ইসলামের নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছিল।

আজ বিশ্বময় মুসলমানদের রাজনৈতিক পরাজয়ের কারণে মুসলিম সমাজে ঈসায়ি সনের ছড়াছড়ি হলেও, মুসলমানরা নিজেদের শরয়ি ও দ্বীনি প্রয়োজনে হিজরি সনের চর্চা করে যাওয়া উচিত। দ্বিতীয়ত, ইহুদি-নাসারাদের সংস্কৃতি একান্ত বাধ্য হয়ে ব্যবহার করা লাগলেও কুরআন সুন্নাহয় তাদের হীনতা ও মুসলমানদের প্রতি তাদের নিকৃষ্ট বিদ্বেষের কথা বারবার বলা হয়েছে। তাই যে কোনো সংস্কৃতি আমরা হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করতে পারি না।

-মুহাম্মদ ফজলে এলাহী, হাতিয়া নোয়াখালি।
শিক্ষার্থী, ফিকহ গবেষণা বিভাগ, জামিআ শাইখ জাকারিয়া, উত্তরখান, ঢাকা।

ফিরতি মেইল: মাশাআল্লাহ, গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় উঠে এসেছে। বর্ষপুঞ্জি কিন্তু সংস্কৃতির বিশাল প্রতিনিধিত্ব করে। তাই আমাদেরকে নিজেদের সংস্কৃতির স্বকীয়তা রক্ষায় সচেতন থাকতে হবে।

০১/৫/২০২৪ ঈসায়ি

ফিলিস্তিনের জন্য কুনুতে নাযেলা!

ফিলিস্তিতে সম্রাজ্যবাদীদের হত্যাযজ্ঞের কথা আমরা সবাই জানি। একদিকে সম্রাজ্যবাদী মানবতা বিরোধী নরপিচাশদের গণহত্যা, অন্যদিকে স্বজাতির মুনাফেকি; এই যেন পৃথিবীতে গাদ্দারির নিকৃষ্ট প্রদর্শন চলছে। আজ ফিলিস্তিনের গাজায় হাজার হাজার শিশু হত্যা হচ্ছে, নারী ও বৃদ্ধ হত্যা হচ্ছে, খাবারে অভাবে মানুষ মৃত্যু বরণ করছে, একটু চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই। বিশ্বের মানবতার ধ্বজাধারীরা দুয়েকটি বিবৃতি দিয়ে দায়সারা করছে। আরব নামের বর্তমান মুনাফেক জাতি চোখ বুঝে অশ্লীলতায় নিমজ্জিত হয়ে আছে। ঠিক এই সময়ে হাজার মাইল দূরের অসহায়ের কি কিছুই করার নেই? হ্যাঁ, অবশ্যই আছে। ইসলাম এমন পরিস্থিতিতেও মজলুম ভাইয়ের পাশে দাঁড়ানোর নির্দেশনা দিয়েছেন কুনূতে নাযেলা পড়ার মাধ্যমে। খোদ রসুলুল্লাহ স. এই আমল করে আমাদের শিখিয়েছেন। আমার-আপনার নিষ্ঠাপূর্ণ ও রোনাজরিমূলক এই আমলের বদৌলতে আল্লাহ তাআলা তাদের উপর গজব নাজিল করতেও পারেন।

মুহাম্মদ আবির হুসাইন,
শিক্ষার্থী, ২য় বর্ষ, দারুল ইলম আল-ইসলামিয়া ঢাকা।

০৮/৬/২৩ ঈসায়ি

যৌথ শ্বশ্রূষায় বিড়ালটি সুস্থ হলো!

সহমর্মিতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ছিল বিড়ালের বিষয়টি। আমাদের মাদরাসার পাশের ঘরে একটি বিড়াল ছিল। মাঝে-মধ্যে মাদরাসায় এসে খাবার খেত। ঘটনাক্রমে একদিন দেখি বিড়ালটি সিঁড়ির নিচে বেহাল দশায় পড়ে আছে। শরীর ক্ষত-বিক্ষত। তদন্ত করার পর জানা গেল যে, তাকে প্রথমে গরম পানি নিক্ষেপ করা হল। এরপর দুইবার ভাতের গরম ফেন নিক্ষেপ করা হলো গায়ে। বেচারা জীবন সন্ধিক্ষণে কোথায় আশ্রয় নিবে, হয়তো মাদরাসার কথা তার জানা ছিল সেখানের কেউ তাকে নির্মম ভাবে হত্যা করবে না, এই বিশ্বাস তার ছিল।

আমি প্রথমে দেখে ভয় পেয়ে যাই। সাথিরাও কেউ ভয়ে আগাচ্ছিল না। পরে আমরা তাকে খাবার দিই। খাবার খেয়ে সে একটু সুস্থ হয়ে উঠে। নড়াছড়া করতে শুরু করে। পরে ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করে তাকে ব্যান্ডিজ করার ব্যবস্থাও করে মাদরাসার শিক্ষার্থীরা! কিন্তু বিড়াল তো তাতে অভ্যস্থ না। আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য ভিন্ন নিয়ম রেখেছেন। সে ব্যান্ডিজ ফেলে দেয়। তবে ব্যান্ডিজ ছাড়াই সে ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠে।

মু. শিহাব উদ্দীন। উত্তরখান, ঢাকা।
শিক্ষর্থী, মিশকাত জামাত, জামিআ শাইখ জাকারিয়া রহ.,
কাঁচকুড়া, উত্তরখান, ঢাকা।

ফিরতি মেইল: এই নিরেট মানবতা ওহীর শিক্ষায় শিক্ষিতদের পক্ষ থেকেই সম্ভব। কারণ তারা এই শিক্ষা কুরআন-সুন্নাহ থেকে সবার্গ্রে পেয়ে থাকে। যদিও আজকাল শব্দ সন্ত্রাসের যুগে চির সন্ত্রাসীরা গায়ের জোরে মানবতা শব্দটি দখল করে রেখেছে!

২০/৬/২৩ ঈসায়ি

মাদরাসায় কেনো এলাম

(জাগতিক শিক্ষার অসারতা)

পৃথিবীব্যাপী জাগতিক শিক্ষার এত ছড়াছড়ি এবং এত স্বীকৃতি থাকা সত্ত্বেও আমি এলাম সম্পূর্ণ ঐশি শিক্ষা অর্জন করতে। আমি যে শিক্ষা অর্জন করতে এলাম, এই শিক্ষার জাগতিক কোনো স্বীকৃতি তো নেই, বরং পুরো বিশ্ব মোড়লারা এই শিক্ষা বন্ধ করার জন্য বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার খরচ করছে। তাবৎ বিশ্ব মিডিয়া এই শিক্ষা ব্যবস্থার বিরোধিতা করার জন্য ওৎ পেতে আছে। এরপরও আমি সগৌরবে এই শিক্ষা অর্জন করতে এলাম। আমার পরিবার-পরিজন আমাকে এই শিক্ষা অর্জন করার জন্য সর্বপ্রকার সাপোর্ট দিয়ে যাচ্ছে। আমি পৃথিবীর সকল আড়ম্বরতাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে নিজের জীবনের জন্য এই শিক্ষাকেই চূড়ান্ত সফলতার চাবিকাঠি মনে করছি। কেনো?

হ্যাঁ, এর একটি সহজ উত্তর রয়েছে। আর তা হলো– শিক্ষা হলো জাতীর মেরুদণ্ড। তথা শিক্ষার মাধ্যমেই একটি জাতি নিজেকে বিকাশ করবে। উন্নতির শিখরে নিয়ে যাবে। এখন যদি কোনো শিক্ষা জাতিকে উন্নতির বদৌলতে অন্ধকারে নিক্ষেপ করে। জাতিকে মারামারি আর খুনাখুনিতে লিপ্ত করে, তাহলে সেই শিক্ষা অর্জনের চেয়ে মূর্খ থাকাই ভালো।

যদি বলা হয় যে, কোনো শিক্ষাই মানুষকে খারাপ বানায় না। তাহলে আমি সবিনয়ে এর বিরোধিতা করব। কারণ নিছক বিদ্যার্জন তেমন কোনো ফলদায়ক নয়, যদি সে বিদ্যায় নৈতিকতার পাঠ না থাকে। আর এই কথা সর্বজন বিদিত যে, নৈতিকতার পাঠ শুধু ধর্মীয় শিক্ষাতেই রয়েছে। ধর্মীয় শিক্ষা ছাড়া যদি কোনো শিক্ষাব্যবস্থায় নৈতিকতার লক্ষণ দেখা যায়, তাহলে তা ধর্মীয় শিক্ষার সমন্বয়নের কারণেই হয়েছে।

কাটা গায়ে লবণ যেন!

এমনিতেই নৈতিকতার অভাবে জাগতিক শিক্ষা জাতির জন্য বিষবাষ্প হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার উপর শয়তানের দোসররা করছে হোলিখেলা। সামাজিক কারণেই জাগতিক শিক্ষালয়গুলোতেও যৎসামান্য ধর্মচর্চার যে রেওয়াজ ছিল, যার নূন্যতম প্রভাবে কিছুটা হলেও নৈতিকতার অস্তিত্ব বাকি ছিল, আজ তাও বন্ধ করার পূর্ণ পাঁয়তারা চলছে। আসলে শয়তান চায় না, আদম সন্তান মানুষ হোক। সে চায় তারা মানুষ রূপি শয়তান হয়ে বেড়ে উঠুক।

- ইয়াসিন আমীন, ময়মনসিংহ।
হিদায়া জামাত, দারুল ইলম আল-ইসলামিয়া ঢাকা।

ফিরতি মেইল: চমৎকার বলেছ ইয়াসিন। নীতিবান পিতা-মাতাগণ আজ তাদের সন্তানদের নিয়ে বেশ উদ্বিগ্ন। কোথায় পড়ালে, কোন শিক্ষায় শিক্ষিত করলে তাদের সন্তানরা মানুষের মতো মানুষ হবে, নৈতিক শিক্ষা কোথায় রয়েছে, এই নিয়ে তাদের চিন্তার শেষ নেই। এক্ষেত্রে যদি তারা চোখ বুজে আল্লাহ দেওয়া এই নিয়ামতকে আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করতে পারতেন, তাহলে তাদের ইহকাল-পরকাল দুই-ই সফলতাময় হত।

২৮/০৭/২০২৩ ঈসায়ি

দারুল ইলম:
পিতৃত্বের ছায়া যেখানে

ভালো একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আসার স্বপ্ন ছিল। যেখানে এলে আমি স্বপ্ন নিয়ে বড়ো হতে পারব। আমার জানাশোনার অনেক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে ধারণা ছিলও। ভেবেছিলাম হয়তো সেগুলো থেকে কোনো প্রতিষ্ঠানেই পড়া হবে। কিন্তু আমার উস্তাদে মুহতারাম হযরত মাওলানা আনোয়ার হুসাইন সাহেব যে, আমাকে এমন স্বপ্নময় প্রতিষ্ঠানে পাঠাবেন, আমার কল্পনাও ছিল না। তিনি আমাকে পাঠালেন হযরত মাওলানা হুসাইন আলহুদা সাহেবের কাছে। হুজুরের হাতে দারুল ইলম মাত্র পথচলা শুরু হলো। বাহ্যিক সামান কিছুই নেই। একটি জীর্ণ কুটিরে দারুল ইলমের দারস শুরু হলো। কিন্তু এই কুটিরে বসে হুজুর আমাদের নিয়ে গেলেন সোনালি এক প্রান্তরে। যেখানে কেবল সফল লোকদের বিচরণ। আমরাও তাদের মতো সফল হওয়ার নেশায় যে কোনো প্রকারের মেহনতের জন্য শপথ গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয়ে যাই। ইনশাআল্লাহ, হুজুরের তত্ত্বাবধানে থাকলে সফলতা আমাদেরই হাতছানি দেবে

হুজুরের আরেকটি বিষয় হলো 'নিখুঁত তারবিয়্যাত।' এক্ষেত্রে হুজুর বিন্দু পরিমাণ ছাড় দিতে নারাজ। একজন সচেতন পিতার ন্যায় হুজুর আমাদের প্রতিটি বিষয়ে নজর রাখেন। কখনও স্নেহে বুঝিয়ে বলেন। কখনও শাসনের মাধ্যমে অন্তর্চক্ষু দিয়ে বুঝার সবক দেন।

-হাফেজ ওমর ফারুক, লক্ষ্মীপুর।
২য় বর্ষ, দারুল ইলম আল-ইসলামিয়া ঢাকা।

নবীনদের লেখাগুলো পরিচর্যা করে সুরভি ছাপানোর উপযুক্ত করে তুলে। তাই নবীনরা যে কোনো লেখা পাঠাতে পারো তোমাদের প্রিয় পত্রে। অপেক্ষায় থাকলাম।